শুকতারা

অষ্টাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

ফাল্গুন

১৩৭১

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হারিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

শুকতারার নতুন বছর

শুকতারার আরও একটি বছর শেষ হয়েছে। এই ফাল্গুন মাস থেকে **শুকতারার আঠারো বছর** চলছে।

এ বছরে শুকতারাকে আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় করে তুলবার নানা রকম আয়োজন করা হচ্ছে। জ্ঞান, বিজ্ঞান, গল্প, কবিতা, ছড়া, ম্যাজিক, মজার খেলা, বুদ্ধির খেলা এ সব তো থাকছেই; তার ওপর থাকছে সব্যসাচীর লেখা ধারাবাহিক **টারজানের নতুন অ্যাডভেঞ্চার** ও রাজকুমার মৈত্রের লেখা রহস্য উপন্যাস **অভিশপ্ত মূর্তি**। **হাঁদা-ভোঁদার** নতুন কীর্তিকলাপও চলবে।

যারা এখনো এই বছরের গ্রাহক-চাঁদা পাঠাওনি, তারা তাড়াতাড়ি মনিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হয়ে যাও। যারা নতুন গ্রাহক হচ্ছ তারা 'নতুন' কথাটি উল্লেখ করবে। পুরনো হলে গ্রাহক নম্বরটি উল্লেখ করবে। শুকতারার এক বছরের চাঁদা পাঁচ টাকা আর ছয় মাসের চাঁদা দু' টাকা পঁচাত্তর পয়সা। ফাল্গুন মাস থেকে বার্ষিক গ্রাহক হতে হয়। ষাণ্মাসিক গ্রাহক হওয়ার নিয়ম ফাল্গুন থেকে শ্রাবণ অথবা ভাদ্র থেকে মাঘ মাস অবধি। ভিঃ পিঃতে গ্রাহক হলে অতিরিক্ত ৫৫ পয়সা বেশী লাগবে। তার চেয়ে টাকা মনিঅর্ডারে পাঠানো বা অফিসে হাতে জমা দেওয়াই ভালো।

নব কল্লোল

বড়দের মাসিক পত্র

ফাল্গুন সংখ্যায় থাকবে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—ধারাবাহিক উপন্যাস
মায়া বসু—সম্পূর্ণ উপন্যাস
বিমলচন্দ্র ঘোষ—কবিতা
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—ফিচার
অমলেন্দু ভট্টাচার্য—গল্প
তন্ময় বাগচী—গল্প
তুষার চ্যাটার্জী—চিত্রে কাহিনী
ডাঃ জীবনকুমার সেনগুপ্ত—শারীরিক প্রশ্ন ও উত্তর
ডাঃ নগেন্দ্রনাথ দে—মানসিক
চিত্রাভিনেতা অশোককুমার—স্মৃতিকথা
সবিতা ঘোষ—ইউরোপের চিঠি

তা ছাড়া আরো গল্প, ফিচার, ছবি, সিনেমা, অন্যান্য চিত্র, কার্টুন আরো অনেক কিছু— বইতে দেখুন।

শুকতারা

ছোটদের মাসিক পত্রিকা

৮০ পাতার বই দাম—৫০ পয়সা

চৈত্র মাসে থাকবে

হাঁদা-ভোঁদা—ছবিতে মজার গল্প
তুষার চ্যাটার্জী—ছবিতে অ্যাডভেঞ্চার
রাজকুমার মৈত্র—ধারাবাহিক উপন্যাস
দেবযানী করগুপ্ত—গল্প
যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রবন্ধ
সব্যসাচী—টারজানের অ্যাডভেঞ্চার
হরিপদ রায়—গল্প
অতীন বসু—গল্প

তাছাড়া আরো গল্প, কবিতা, বুদ্ধির খেলা, মজার পাতা, খেলা, আরো অনেক কিছু।

দেব সাহিত্য কুটীর—কলিকাতা-৯

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal).

(Vide Patna Gazette, 30th Dec., 1950).

সূচীপত্র—ফাল্গুন, ১৩৭১

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	প্রহ্লাদ (কবিতা) ...	বিমলচন্দ্র ঘোষ	প্রথম ছবির পেছনে
২।	গবেষণা (কবিতা) ...	প্রভাকর মাঝি ...	১
৩।	ভৌতিক (গল্প) ...	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ...	৩
৪।	যেমন গুরু, তেমন তাঁর শিষ্য (জানবার কথা)	— ...	১০
৫।	অভিশপ্ত মূর্তি (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	রাজকুমার মৈত্র ...	১১
৬।	বই কেনার পাগলামো (জীবনকথা) ...	জীবন ভৌমিক ...	২১
৭।	লম্বা করা (কার্টুন) ...	পরিচয় গুপ্ত ...	২২
৮।	যারা ভোলে না (গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	২৩
৯।	ব্যারোমিটারের গলদ (জানবার কথা) ...	— ...	৩০
১০।	লাস ভেগাস (ভ্রমণকাহিনী) ...	জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার ...	৩১
১১।	তেল চুরির রহস্য (সত্য ঘটনা) ...	পূরবী দেবী ...	৩৪
১২।	অবাক গল্প (কবিতা) ...	শ্রীসমীরকুমার শেঠ ...	৪৩
১৩।	সখের গোয়েন্দা নিশীথ রায় ...	তুষারকান্তি চ্যাটার্জি ...	৪৪
১৪।	টারজানের অ্যাডভেঞ্চার ...	সব্যসাচী ...	৪৬
১৫।	"মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৫৫
১৬।	মনের মতো মানুষ (জীবনকথা) ...	তপতীরানী ...	৫৬
১৭।	ছড়া ...	আবু কায়সার ...	৫৭
১৮।	ত্র্যহ-স্পর্শ (গল্প) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৫৮
১৯।	বুদ্ধির খেলা ...	— ...	৬৩
২০।	হাঁদা-ভোঁদার আক্কেল সেলামী (চিত্রে গল্প)...	—	৬৪, ৬৫, ৭৫
২১।	বিচারে রাজা দোষী (গল্প) ...	শ্রীঅমিতাভ মিত্র ...	৬৬
২২।	ন্যায্য ভাগ (কমিক গল্প) ...	প্রশান্ত রায়চৌধুরী ...	৭৩
২৩।	ঘড়ি দেখে দিক ঠিক করো (বিজ্ঞান-বিচিত্রা)	শ্রীবৈজ্ঞানিক ...	৭৪
২৪।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৭৬
২৫।	ডব্লিউ. জি. গ্রেস ও ডেড বল (খেলাধুলা) ...	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭৭

দিলীপের দলবল ইস্কুলের ফিল্ম শো-তে
উনি আমাদের আজ একটা ফিল্ম দেখাবেন। তোমরা যে যার জায়গায় চুপ ক'রে বসে থাকবে বুঝলে!
হুর্‌রে!
এই, সব চুপ!
তোমরা কেউ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এলেই আমি শুরু করতে পারি।
আমি নিভিয়ে আসছি!
না, না আমি যাচ্ছি!
আজ আমি যে ছবিটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তাতে দেখবে উড়ো-জাহাজ। কি ভাবে উড়ো জাহাজ তৈরি হয়, কি ভাবে চলে— তা এ ছবিতে তোমরা সব দেখতে পাবে!
হুর্‌রে!
দিলীপ! ঐ দ্যাখ, জেট্‌ প্লেন!
চুপ, চুপ! বসে পড়!
এ কী হল?
বন্ধ হয়ে গেল যে!
ইস, কী কাণ্ড!
কী মুস্কিল! ফিল্মটা কেটে গেছে। এক্ষুনি ঠিক করে ফেলছি। একটু আলো চাই যে। কেউ উঠে বাতি জ্বেলে দেবে?...
বাতি জ্বালাবার দরকার হবে না। আমি টর্চ ধরছি, আপনি যা সারাবার সারিয়ে ফেলুন!
হ্যাঁ, হ্যাঁ সেই ভালো!
ব্যস, সব ঠিক হয়ে গেছে। ভাগ্যিস, হাতের কাছেই একটা টর্চ ছিল!
যাক! এবার আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে ছবিটা দেখতে পারব।
হাতের কাছে যেন সব সময় 'এভারেডী' টর্চ থাকে। কখন কী দরকার পড়ে কে বলতে পারে!

IWTUC 2141

প্রহ্লাদ : সাপের ক্রুদ্ধ ফণাও যাঁর কাছে নুয়ে পড়ে

॥ প্রহ্লাদ ॥

[কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কৈশোর রচনা]

বিষ খেয়ে যে অমর হয়ে
রইলো পাষাণ কারাগারে,
আদর করে দয়াল হরি
বক্ষে তুলে নিলেন যারে,
ফেললে যারে ক্রুদ্ধ পিতা
মাতাল হাতির পায়ের তলে
মাথায় যারে তুললো হাতি
হরিনামের মন্ত্রবলে,
ভক্তিমতী কয়াধু যার
জন্মদাত্রী অনিন্দিতা
ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ সেই
হরিদ্বেষী যাহার পিতা।

আগুন যাহার স্পর্শ পেয়ে
শীতল হয়ে ধরলো বুকে,
পাষাণ কারার অন্ধকারে
হরির ধ্যানে রয় যে সুখে,
কণ্ঠ হ'তে হরিনামের
মন্ত্র নীরব করতে যাহার,
আনলো ঘাতক মশানেতে
চূর্ণ হ'ল অস্ত্র যে তা'র!
স্পর্শে যাহার যন্ত্রণাময়
নিভলো সকল ব্যথার চিতা,
ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ সেই
হরিদ্বেষী যাহার পিতা।

ফেললে যারে সিন্ধুবুকে
বক্ষে বাঁধি পাষাণ শিলা
জলের বুকে ভাসলো পাথর
শ্রীরাম নামের অপার লীলা!
দৈত্যবাপের দেবতা ছেলে
প্রেম সাধনায় সিদ্ধ বালক,
দাস হয়ে যার করলো সেবা
দয়াল হরি বিশ্বপালক।
যার সাধনায় মুক্ত হ'ল
এই ধরণী শৃঙ্খলিতা,
ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদ সেই
হরিদ্বেষী যাহার পিতা।

"অপ্রকাশিত"

৭ই অক্টোবর ১৯২৫

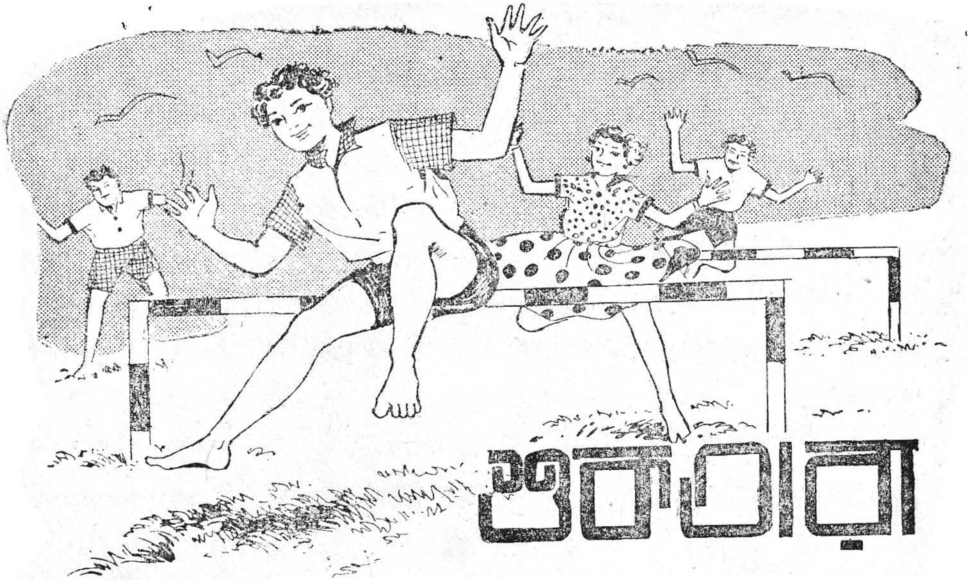

অষ্টাদশ বর্ষ ● ১ম সংখ্যা ● ১৩৭১, ফাল্গুন

গবেষণা

প্রভাকর মাঝি

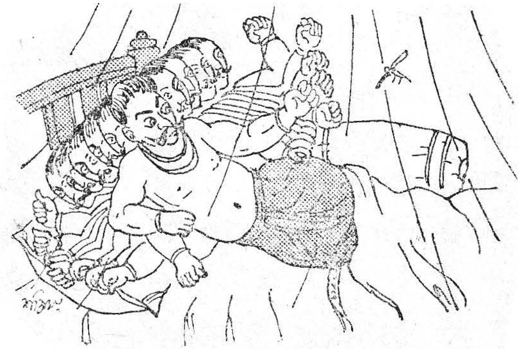

রাবণ রাজার নেটের ভেতর
ফাজিল একটা বাচ্চা মশা
রাত দুপুরে হঠাৎ ঢুকে
করলো কাহিল তাহার দশা।
পিং পিং পিং কানের কাছে
অলক্ষুণে এ কোন্ গীতি,
হুমকি দিয়ে উঠলো রাবণ
ঘুমের দফা যেমনি ইতি।
বিশটা চোখে আগুন জ্বলে,
বিশ হাতে সে ধরতে চায়,
এক মুখেতে ঢুকেই মশা
আরেক মুখে বেরিয়ে যায়।
দাঁত-কড়মড় করছে রাবণ,
ও খেলে যায় চরকি বাজি,
ফুড়ুৎ করে পালায় উড়ে,
পুঁচকে ছোঁড়ার কি কারসাজি!

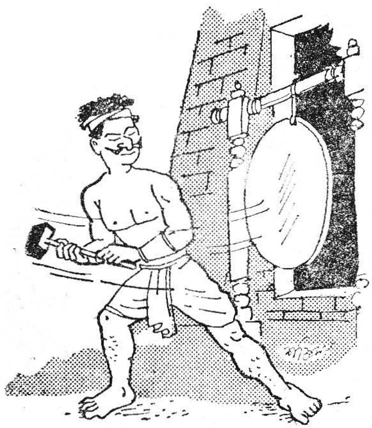

দুপুর রাতে দেউড়িতে তাই
আপৎকালীন ঘণ্টা বাজে,
চোখ রগড়ে অমাত্যেরা
হাজির হোল যে যার কাজে।
লক্ষ ছেলে দৌড়ে এলো,
সঙ্গে সওয়া লক্ষ নাতি,
আসলো নিয়ে হাতের কাছে
যার যা ছিল শাবল গাঁতি।

মন্ত্রী বলে,—"কামান দাগি,
অগ্নি-বাণে পড়ুক কাটা ;"
নাতিরা কয়,—"মশা না ও,
ছদ্মবেশী মুখপোড়াটা।
দাদামশাই হুকুম করুন,
এক্ষুণি এই হাড়গিলেকে
চ্যাপটা করে চাটনি বানাই,
রাক্ষুসীরা দেখুক চেখে।

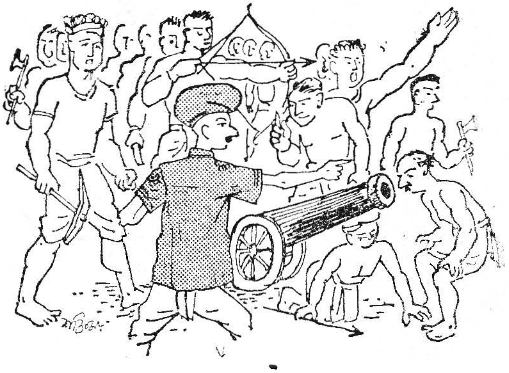

কিষ্কিন্ধ্যার আমদানী ও, যেমনি পাজি তেমনি ঠ্যাটা,—
এ মুখ দিয়ে ঢুকচে, আবার ও মুখ দিয়ে পালায় ব্যাটা।"

তারপরে কি ? তারপরে কি ?
পড়িস রামায়ণটা আমার,
অনেক নথিপত্র ঘেঁটে,
অনেক খেটে করেছি বার।
রোমাঞ্চকর তথ্য কতো
পেলাম গবেষণার ঝোঁকে,
রাবণ রাজার ভয়েই মুনি
চেপে গেলেন সবগুলোকে।

ভৌতিক

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভূত আছে কি নেই এ তর্ক বহুদিনের। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়েও এ ধরনের তর্ক আদিম যুগ থেকে চলে আসছে। দুটো তর্কেরই আজও নিষ্পত্তি হয় নি।

বিজ্ঞানের যুগে তোমরা হয়তো এসব মানতে চাইবে না।

অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্বই নেই, এই তোমাদের মত।

ভূতের কথা তোমাদের মতন এতদিন আমিও বিশ্বাস করতাম না। অনেক জায়গায় ভূত দেখার আমন্ত্রণ পেয়েছি। প'ড়ো বাড়িতে রাত কাটিয়েছি, ঘোর অমাবস্যায় শ্মশানে ঘোরাফেরা করেছি। কিছু চামচিকে আর শেয়াল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে নি।

ভূত সম্বন্ধে আমিও ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়ে উঠছিলাম, এমন সময় ব্যাপারটা ঘটল।

ঠিক আমাদের পাশের বাড়িতে থাকে সমর রায়। ছেলেটি দেখতে যেমন সুন্দর, লেখাপড়াতেও তেমনই উৎসাহী। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগে মাঝে মাঝে আমার কাছে পড়তে আসত। সেই সময়ে তার বিদ্যাবুদ্ধি পরখ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তা ছাড়া একেবারে পাশের বাড়িতে থাকত, খুব ছোটবেলা থেকেই তাকে দেখেছি।

ইদানীং অনেকদিন সমরের সঙ্গে দেখা হয় নি। শুনেছিলাম পরীক্ষার পর সে বাইরে কোথায় বেড়াতে গেছে।

এক সন্ধ্যায় ঘরে বসে একটা বই পড়ছি। বাইরে ঝড়ের আভাস। জানলা, দরজার পর্দাগুলো দমকা বাতাসে উড়ছে। দু এক ফোঁটা বৃষ্টিও যেন গায়ে এসে পড়ল, কিন্তু বইটা এত ভাল লাগছিল যে উঠে গিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করতেও ইচ্ছা করছিল না।

হঠাৎ সশব্দে দরজাটা খুলে গেল। ভাবলাম ঝড়। চোখ ফিরিয়েই কিন্তু অবাক হলাম। সমর এসে দাঁড়িয়েছে। উস্কখুস্ক চুল, পাংশু মুখ।

কি সমর কবে ফিরলে? বইটা মুড়ে প্রশ্ন করলাম।

সমর কৌচে, আমার পাশে বসে বলল, এই একটু আগে। জামা কাপড় ছেড়েই আপনার কাছে চলে আসছি।

কি ব্যাপার? মনে হল সমরের বোধ হয় জরুরী কোন কথা বলবার আছে।

আপনার সময় হবে এখন? আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

হাসলাম, অফুরন্ত সময়। বল কি তোমার কথা?

আপনি ভূত বিশ্বাস করেন মাস্টারমশাই?

এ প্রশ্ন হাজার বার হাজার জায়গায় শুনেছি। সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম, কি বলতে চাইছ বল?

মৃত্যুর পরে মানুষ শেষ হয়ে যায় না মাস্টারমশাই। ভূত বলুন, আত্মা বলুন, তারা আছে। মাঝে মাঝে তারা দেখাও দেয়।

বুঝলাম কোন কারণে সমর খুব উত্তেজিত হয়েছে। অনেকেরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আধোঅন্ধকারে গাছপালা দেখে ভূতপ্রেত কল্পনা করে, কিংবা বদমাইশ লোকের প্রতারণায় ভুলে মনে করে অশরীরী কিছু একটা দেখেছে।

সমরের পিঠে হাত রেখে বললাম, মাথা ঠাণ্ডা করে কি হয়েছে বল তো?

সমর কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ আর কপাল মুছে নিল তারপর একটু দম নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

লক্ষ্ণৌতে আমার এক পিসি আছেন আপনি জানেন বোধ হয়?

হ্যাঁ, তোমার কাছেই শুনেছি। তিনি কোন এক স্কুলের শিক্ষিকা, তাই না ?

সমর ঘাড় নাড়ল, পিসি বৈজনাথ শিক্ষাসদনে পড়ান। তিনি অনেকদিন ধরে তাঁর কাছে আমাকে যেতে লিখছেন কিন্তু এক-টার পর একটা ঝঞ্ঝাটের জন্য যাওয়া আর হয়ে ওঠে নি। তাই পরীক্ষার পর ভাবলাম, এখন তো প্রচুর অবসর, এইবার ঘুরে আসি। মাসখানেক আগে দেরাদুন এক্সপ্রেসে রওনা হয়ে গেলাম।

আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

তোমার বাবার কাছে শুনেছি। আমি কৌচের ওপর পাদুটো তুলে ভাল হয়ে বসলাম।

আপনি শুনলে হাসবেন, এই জীবনে আমার প্রথম রেলযাত্রা। কাজেই উৎসাহের অন্ত ছিল না। প্রত্যেক স্টেশনে, ট্রেন থামতেই আমিও নেমে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে আরম্ভ করি। গার্ডের হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে কামরায় উঠি। কিন্তু এক স্টেশনে বিপদ ঘটল।

আমি সোজা হয়ে বসলাম, কি, ট্রেন ছেড়ে দিল তো ?

সমর আমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বলতে লাগল, এক স্টেশনে নেমে এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখলাম একটি বছর আট বয়েকের মেয়ে, বেশ ফুটফুটে চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, পরনে নীলচে রংয়ের একটা ফ্রক, আমাকে হাত নেড়ে ডাকছে।

প্রথমে ভাবলাম আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটি বোধ হয় অন্য কাউকে

ডাকছে। এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলাম, না আর কেউ তো ধারে কাছে নেই। মেয়েটিকে বাঙালী বলেই মনে হল। প্ল্যাটফর্মের ওপর বেশীর ভাগই অন্য জাতের জটলা। মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমায় সে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

ভাবলাম, বিদেশে মেয়েটি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। আমাকে স্বজাতি দেখে সাহায্য চাইছে।

মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম। মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি এগোতেই সে চলতে শুরু করল স্টেশনের বিশ্রামকক্ষের দিকে। বুঝতে পারলাম, সম্ভবতঃ ওই বিশ্রামকক্ষে তার কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া বিপদে পড়েছেন কিংবা হঠাৎ অসুস্থ হয়েছেন। কিন্তু না, বিশ্রামকক্ষের সামনে একটু দাঁড়িয়ে মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখে আবার হাত নেড়ে ডেকেই আরও এগিয়ে গেল।

এধারে একটা বকুলগাছ। অজস্র বকুল ঝরে পড়েছে পথের ওপর। পাশে স্টেশনের সীমানার রেলিং। মেয়েটি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি জোরে জোরে হেঁটে মেয়েটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, আর ঠিক সেই সময়—

আমি আর উৎকণ্ঠা দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল ?

হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। এদিকে চেয়ে দেখি মেয়েটি উধাও। এক নিমেষে যেন মুছে গেল। আমি ট্রেনের দিকে ছুটলাম, কিন্তু ধরতে পারলাম না। দুরন্ত গতিতে ট্রেন যেন আমার চেষ্টাকে উপহাস করতে করতে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ পরে আমি হাসলাম। এই তোমার ভৌতিক গল্প। মেয়েটি তোমায় বোকা বানিয়ে সরে পড়েছে। বয়স কম হলে হবে কি, মেয়েটি ভারি ওস্তাদ মনে হচ্ছে।

সমর আমার হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর গলায় বলল, আমার কাহিনী এখনও শেষ হয় নি মাস্টারমশাই।

আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। বললাম, বেশ, বলে যাও।

আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে ট্রেন ফেল করার কথা বললাম। তিনি পরের স্টেশনে ফোন করে দিলেন, যাতে তারা আমার বিছানা আর স্যুটকেশটা নামিয়ে রাখতে পারে। এর পরের ট্রেন রাত সাড়ে নটায়। হাতে অঢেল সময়।

সমস্ত বিশ্রামকক্ষগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। কয়েকজন দেহাতী যাত্রী বসে আছে। মেয়েটি কোথাও নেই। স্টেশনের বাইরে এসে কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালাকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না।

আশ্চর্য লাগল, চোখের সামনে থেকে মেয়েটি কি করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই প্রচণ্ড দিনের আলোয় কোথায় সে সরে যেতে পারে।

আশ্চর্য হবার আমার আরও বাকি ছিল।

রাত সাতটা নাগাদ সারা স্টেশনে হইচই। সবাই খুব ব্যস্ত। গিয়ে খবর নিয়েই চমকে উঠলাম। দেরাদুন এক্সপ্রেসের সঙ্গে এক মালগাড়ির ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। অনেক লোক আহত হয়েছে, মারা গেছে বেশ কয়েকজন।

আপাততঃ সব গাড়ি বন্ধ। দু একটা রিলিফ ট্রেন সাহায্য নিয়ে ছোটাছুটি করছে। স্টেশন মাস্টারের কামরায় খুব ভিড়। অনেকেই আত্মীয়স্বজনের খবর নেবার জন্য ব্যাকুল।

ভিড় কমতে খবর পেলাম, দেরাদুন এক্সপ্রেসের সামনের চারখানা বগি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। সামনের তিন নম্বর বগিতে আমার থাকার কথা। সেই মুহূর্তে নতুন করে আবার মেয়েটির কথা মনে এল। মেয়েটি যদি হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে না নিয়ে যেত, তাহলে আমার কি অবস্থা হত ভেবেই শিউরে উঠলাম।

সেই রাত্রেই দুটো টেলিগ্রাম করলাম। একটা কলকাতায় বাড়িতে, আর একটা লক্ষ্ণৌতে, পিসির কাছে। লিখে দিলাম যে ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে আমি বেঁচে গেছি। পথে এক স্টেশনে আমি নেমে পড়েছিলাম।

লাইন ঠিক হতে দিন দুয়েক লাগল। আবার একদিন লক্ষ্ণৌ রওনা হলাম। পিসিকে খবর দিয়ে।

সারা রাত সেই মেয়েটির কথা ভাবলাম। বিধাতার আশীর্বাদের মতন মেয়েটি যেন আমার প্রাণরক্ষা করতেই এসেছিল। কিন্তু কাজ শেষ করে মেয়েটি কোথায় মিলিয়ে গেল।

পরের দিন এগারোটা নাগাদ লক্ষ্ণৌ পৌঁছলাম। স্টেশনে পিসি এসেছিলেন। খুব ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছিলাম, তবু চিনতে অসুবিধা হল না। পিসির চেহারা প্রায় একই রকম আছে।

প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, খবরের কাগজে ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পড়ে আমার যা অবস্থা হয়েছিল। কেবল মনে হচ্ছিল এর জন্য যেন আমিই দায়ী। আমি বার বার তোকে আসতে লিখেছিলাম। তারপর তোর টেলিগ্রামটা পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল। কি ব্যাপার বল তো?

সব ব্যাপারটা বললে পিসি হয়তো বিশ্বাসই করতেন না। বিশেষ করে তিনি যখন স্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। কাজেই মেয়েটির ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গিয়ে বললাম, চা খেতে একটা স্টেশনে নামতে ট্রেন ছেড়ে দিল পিসি। ছুটে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারলাম না।

পিসি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবান তোকে বাঁচিয়েছে। জন্ম জন্ম যেন তোর চা খাওয়ার নেশাটা থাকে।

দুজনে টাঙ্গায় উঠলাম। প্রায় আধঘণ্টারও ওপর চলার পর একটা বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামল। পিসির নির্দেশে।

পিসি নেমে চীৎকার করলেন, সুন্দর, সুন্দর।

একটি ছোকরা নেমে এল। আমার সুটকেশ আর বিছানা নিয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। পিসির পিছন পিছন আমিও ওপরে উঠলাম।

মাঝারি সাইজের একটা ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে পিসি বললেন, ওই ঘরটা তোর। যা জামা কাপড় ছেড়ে নে। আমি জলখাবারের বন্দোবস্ত করি।

শরীর খুবই ক্লান্ত ছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিলাম।

এক কোণে একটা টেবিল, তার ওপর বাতিদান। একটা আলনা, ছোট একটা খাট। দেয়ালে গোটা তিনেক ছবি। সামনের ছবিটার দিকে চাইতেই সমস্ত শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন কেঁপে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল ভয়ের কালো একটা ছায়া আমাকে আবৃত করার চেষ্টা করছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ডাকলাম, পিসি, পিসি।

পিসি বোধ হয় নীচের রান্নাঘরে ছিলেন। কোন সাড়া পেলাম না। কিন্তু পিসিকে আমার একান্ত প্রয়োজন। আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির মাঝবরাবর নেমে আবার ডাকলাম, পিসি, ও পিসি।

এতক্ষণে আমার ডাক পিসির কানে পৌঁছাল।

হন্তদন্ত হয়ে পিসি সিঁড়ির কাছে এসে বললেন, কিরে, কি হয়েছে ?

একটু এ ঘরে এসো তো।

আমি ছুটে ওপরের ঘরে এসে দাঁড়ালাম। হাঁপাতে হাঁপাতে পিসিও এলেন একটু পরে।

কি হল রে তোর ? শরীর খারাপ হয় নি তো ? এত ঘামছিস কেন ?

উঠে দাঁড়িয়ে পড়লাম। [পৃষ্ঠা ৮

জামার আস্তিন দিয়ে কপালের ঘামের বিন্দু মুছে ফেলে বললাম, না, শরীর আমার ঠিক আছে। কিন্তু এ ছবিটা কার ? এই যে ?

হাত দিয়ে সামনের ফটোটা দেখালাম।

পিসি বললেন, ওটা টুনুর ফটো। আমার মেয়ে টুনু।

আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ, তাকে তুই দেখিস নি। তোর জন্মাবার বছর খানেক আগে টুনু মারা গেছে। টাইফয়েডে। বোধ হয় বছর আটেক হয়েছিল বয়স।

শেষদিকে পিসির কণ্ঠস্বর একটু গাঢ় হয়ে এল।

কিন্তু— ঠোঁটটা কামড়ে থেমে গেলাম।

কিন্তু কিরে, কি বলবি বল ? পিসি বললেন।

তুমি কি বিশ্বাস করবে পিসি ? বিশ্বাস করবার কথা নয়।

কথাটা বল তবে তো বুঝব বিশ্বাস করার কথা কিনা। পিসি আমার ভাবভঙ্গী দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন।

টুনুদির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে পিসি।

আমার কথা শেষ হবার আগেই পিসি ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লেন। ভাবলেন, নির্ঘাৎ ছেলেটার মাথা খারাপ হয়েছে।

একটু একটু করে সব বললাম। যখন শেষ করলাম, পিসির চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। পিসি বিজ্ঞান পড়ান, কিন্তু একটি কথার প্রতিবাদ করলেন না, কিছু অবিশ্বাস করলেন না। শুধু বললেন, টুনুই তোর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

এবার সমর আমার দিকে ঘুরে বসল।

বলুন মাস্টারমশাই কি করে এটা সম্ভব? মারা যাবার পরও কি আত্মার স্নেহ, দয়া, মায়ার আকর্ষণ থাকে? নিজের আত্মীয়দের বাঁচাবার জন্য তারা কি মানুষের দেহ ধরে আবার ফিরে আসতে পারে মরলোকে?

বাইরে ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমগাছের একটা ডাল জানলার পাল্লায় মাথা ঠুকছে অনবরত। জলের ঝাপটায় ঘরের অনেকখানি ভিজে গিয়েছে।

সেই দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। কি উত্তর দেব সমরের প্রশ্নের।

চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মানুষ নিজের লোককে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে? তাও কি সম্ভব!

———

যেমন গুরু, তেমন তাঁর শিষ্য

বিখ্যাত আবিষ্কারক টমাস এডিসনের সহকারী ছিলেন কানাডার অধিবাসী—অব্রে ফেসেনডেন। শোনা যায়, সর্বপ্রথম তিনিই নাকি মানুষের কণ্ঠ-সংগীত রেডিয়োতে প্রচার করেছিলেন। ১৯০৬ সালে বড়দিনের পূর্বক্ষণে জগদ্বিখ্যাত গীতিকার হেণ্ডেল ও গৌনডের দুটি সংগীত তিনি ফনোগ্রাফে শুনিয়েছিলেন। এ থেকে মনে হয়, গুরুর চেয়ে শিষ্যের কৃতিত্বও নিতান্ত কম ছিল না।

রাজকুমার মৈত্র

॥ এক ॥

সূত্রপাত

১৯৬০ সাল।

ফেব্রুয়ারীর এক নিস্তব্ধ রাত জেগে উঠল রিভলভারের গর্জনে।

পর পর দুবার।

আর্তনাদ করে উঠল একটা মানুষ। রক্তাপ্লুত একটা দেহ লুটিয়ে পড়ল।···

কলকাতার বুকে জাদুঘরের পাষাণ চত্বরে কতকগুলো মানুষ জিঘাংসায় মেতে উঠেছিল। তারই পরিণামে বলি হল একটি জীবন।

তখন রাত বারোটা।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রফেসর ত্রিদিব সেন তাঁর দৈনন্দিন কাজ শেষ করে চত্বরে আসতেই এক আগন্তুক তাঁকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল—

আগন্তুক বোধহয় জানত না যে ত্রিদিব সেনের ভৃত্য ভ্রমর সিং বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র। আগন্তুক রিভলভার তাক করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে ভ্রমর সিং ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল আগন্তুক। গুলিটা লাগল ভ্রমর সিংএর বাহুতে।

প্রফেসর সেন চকিতে সরে গিয়েছিলেন। আগন্তুক তখন পালাচ্ছে।

প্রফেসর ত্রিদিব সেনের হাতের কোল্ট রিভলভারটা গর্জন করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চীৎকার। লুটিয়ে পড়ল আগন্তুক।

নীচ থেকে দারোয়ান ছুটে আসার আগেই প্রফেসর সেন মৃত আগন্তুকের দেহ সার্চ করে একটা কাগজ পেলেন।

আগন্তুক একজন চীনা।

* * *

প্রফেসর ত্রিদিব সেনের চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলার সাহস কারও ছিল না। এমন কি জাদুঘরের সুপারিনটেণ্ডেণ্টেরও না। দীর্ঘ ছ' ফুট চেহারা নিয়ে ঝড়ের মত হাঁটেন তিনি—জাদুঘরের লম্বা চত্বর অতিক্রম করতে ত্রিশ সেকেণ্ডও সময় লাগে না তাঁর। বয়স হয়েছে প্রফেসর সেনের, কিন্তু দেখলে মনেই হবে না যে তিনি বাহান্নটি শীত অতিক্রম করে গেছেন অনায়াসে।

দোহারা গড়ন, খাড়াই নাকটি মুখের তুলনায় বেমানান। তীক্ষ্ণ কঠিন একজোড়া চোখ। ভ্রূযুগল চওড়া, আরও চওড়া ওঁর ঠোঁটদুটি।

তিনি যখন ছাত্রদের সামনে লেকচার দেন তখন জাদুঘরের নীচের তলা থেকে তাঁর বজ্রের মত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর প্রভূত জ্ঞান। অদ্ভুত তাঁর মনীষা।

জাদুঘরটি তাঁর কাছে মন্দির। দিনরাত সেই মন্দিরে থেকে রিসার্চ করাই তাঁর সাধনা। অসীম ধৈর্যবলে তিনি একটা স্পেসিমেন নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা করেন···

তখন বাহ্যজ্ঞান থাকে না তাঁর। পৃথিবী যদি রসাতলে যায় তবুও না। কিন্তু আশ্চর্য, বেলা দশটা বাজলেই তিনি কাজ ফেলে ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন উন্মুখ হয়ে।

দশটা থেকে দুটো একনাগাড়ে ছাত্রদের সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করতেন। একই জিনিস নিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর লেকচার দিতে তাঁর অবসাদ জাগত না।

বলে যেতেন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি সম্পর্কে প্রত্ন-তাত্ত্বিক নিদর্শন বিশেষ মূল্যবান, তা সে যে কোন দেশেরই হোক। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে সৌধ, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।··· ইত্যাদি।

তারপর বলতেন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকদের নাম,—হ্যামিল্টন, বুকানন, প্রিন্সেপ, কানিংহাম, জন মার্শাল আর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়···।

ছাত্রের দল মুগ্ধ হয়ে শুনত প্রফেসর সেনের কথা। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে।

প্রফেসর সেন জাদুঘরে আসতেন সকালেই। সঙ্গে থাকে বিশ্বস্ত ভৃত্য ভ্রমর সিং।

লোকটার চেহারা সত্যি ভয়ংকর। কথা বলে কম। সারাদিন অতন্দ্র প্রহরীর মত সে পাহারায় থাকে। সে জানে তার প্রভুর মেজাজ।

পাছে কেউ তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করে সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর থাকত।

সন্ধ্যা নেমে আসে।

আসে রাত্রি। ভ্রমর সিং ঠায় বসে থাকে। রাত্রের অন্ধকারে জাদুঘরের ভেতরটায় বুকচাপা স্তব্ধতা নেমে আসে···

চৌরঙ্গীর কোলাহল জাদুঘরের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করতে পারে না। তখন মনে হয় যেন ওপাশের চত্বরে কেউ ফিসফিস করে কথা বলছে।

ওপাশের চত্বরে গেলে মনে হয় ফিসফিসানিটা থেমে গেল। জাদুঘরে যারা সন্ধ্যার পর থাকেনি তারা উপলব্ধি করতে পারবে না বুকচাপা নিস্তব্ধতা কতখানি অস্বস্তিকর। ভ্রমর সিংএর মত লোকেরও প্রথমটা বুক ছমছম করত···

তাই সে আজও থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে—শুনতা হুঁ!

চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনটা জাদুঘরের প্রাচীরে প্রাচীরে, চত্বরের আনাচেকানাচে ঘা খেয়ে প্রতিধ্বনি তোলে—শুনতা হুঁ!

প্রফেসর সেন আপনমনে কাজ করতে করতে চমকে উঠতেন। প্রথম কয়েক দিন রুম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন চত্বরে।

—ভ্রমর সিং, কি হয়েছে, কি শুনেছো?

ভ্রমর সিংএর চোখদুটো অন্ধকারে জ্বলে। দৈত্যের মত চেহারায় চোখদুটো খুবই মানানসই।

প্রভুর মুখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে জবাব দিত,—আপকা কাম করিয়ে বাবুজি। ইধর ম্যয় সামহালতা হুঁ—

প্রফেসর সেন ঠোঁটের কোণে পাইপ চেপে ধরে কড়া তামাকের ধোঁয়া গলতে গিলতে ফিরে যেতেন নিজের কাজে।

ঢং ঢং—রাত বারোটা বাজল।

প্রফেসর চত্বরে বেরিয়ে আসতেন—ভ্রমর সিং, দরজায় তালা লাগাও।

আদেশ পাওয়ামাত্র ভ্রমর সিং বিরাট দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গর্জে উঠত—শুনতা হুঁ!

তারপরই শোনা যেত চত্বরের ওপর ভারী বুটের আওয়াজ। নীচ থেকে দুজন দারোয়ান উঠে আসছে।

ভ্রমর সিং প্রফেসরের পিছনে পিছনে নেমে আসত। দারোয়ানের হাতে চাবি দিয়ে ওঁরা ওঁদের গাড়িতে উঠে বসতেন। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটত যোধপুর পার্কের দিকে।

প্রফেসর ত্রিদিব সেন একটি অদ্ভুত চরিত্র।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি এম. এ. পাস করে পি-এইচ. ডি. উপাধি পেয়ে দেশে ফিরে আসেন।

তাঁর পিতা স্বর্গীয় কিঙ্কর সেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও ছিলেন অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।

ত্রিদিব সেনের যখন দশ বছর বয়স তখন তিনি পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। প্রায় পাঁচ বছর তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। শেষে ত্রিদিব সেন যেবার বিলেত যাবার আয়োজন করছেন সেই সময় একটি চিঠি আসে চীনের হুনান প্রদেশ থেকে।

চিঠিটা ছোট্ট। কয়েকটি কথা কিঙ্কর সেন লিখেছিলেন ত্রিদিব সেনের পিতামহকে। লিখেছিলেন,—

যদি কখনও ফিরি তবে আমার সঙ্গে থাকবে বহুমূল্যবান একটি অভিশাপ।

যদি না ফিরতে পারি তবে জানবেন অভিশপ্ত ইতিহাসের অন্ধকারে আমি পথ হারিয়েছি। ত্রিদিবকে বলবেন বিলেতে গিয়ে সে যেন প্রত্নতত্ত্ব স্পেশাল সাবজেক্ট হিসেবে নেয়।

কিঙ্কর সেনের চিঠি পড়ে সেদিন ত্রিদিব সেন বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন এই ভেবে যে সুদূর হুনান প্রদেশে থেকে তাঁর পিতা কিভাবে জানলেন যে তাঁর পুত্র বিলেত যাবার আয়োজন করেছে। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিলেন প্রফেসর সেন, সুতরাং পিতা পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়ে পড়তে তাঁর অবলম্বন বলতে ছিলেন একমাত্র বৃদ্ধ পিতামহ।

আপকা কাম করিয়ে বাবুজি।　[পৃষ্ঠা ১৪

তারপর বহুকাল কেটে গেছে। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে যোগদান করেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিলেতে থাকাকালীন তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ পরলোকগমন করেন। সুতরাং ত্রিদিব সেনের আপন বলতে আর কেউ ছিল না।

বিবাহ তিনি করেননি।

এই সময় তিনি কিঙ্কর সেনের কাছ থেকে আর একটি চিঠি পেয়েছিলেন। পিতার শেষ চিঠি।

চিঠিটা লেখা হয়েছিল বহুকাল আগে। ছোট্ট চিঠি—কিঙ্কর সেন লিখেছিলেন,—

ত্রিদিব, এই চিঠি তুমি কখনও পাবে কি না জানি না। পত্রবাহক আমার বিশ্বস্ত অনুচর। ওকে যদি কেউ হত্যা না করে তবে চিঠিটা তুমি পাবেই। পত্রবাহক তোমাকে যে ম্যাপটি দেবে সেটা নিয়ে এসিয়াটিক সোসাইটিতে যাবে। সেখানে আমার বন্ধু অমিয়রঞ্জন দে-র সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমাকে বলে দেবেন আমি বর্তমানে কোথায় আছি এবং কেন। হিমপ্রবাহে সর্বাঙ্গ ক্রমশঃ অবশ হয়ে আসছে। দুর্লঙ্ঘ্য তুষারগিরি অতিক্রম করার মত শক্তি আমার নেই। আমি বন্দী। আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর। ইতি—

তোমার হতভাগ্য পিতা কিঙ্কর সেন

* * *

চিঠিটা পাওয়ার পর ত্রিদিব সেন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন।

তখন ইংরেজ দিল্লীর মসনদে বসে।

এসিয়াটিক সোসাইটির সচিব ছিলেন এক ইংরেজ। পিতৃবন্ধু অমিয়রঞ্জন দে ছিলেন তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারী।

ত্রিদিব সেন অমিয়রঞ্জন দে-র সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তখন বড় দেরি হয়ে গেছে। অমিয়রঞ্জন জানতে চাইলেন ম্যাপটির কথা।

কোথায় ম্যাপ! পত্রবাহকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি। হয়তো পিতামহের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কোন ব্যবস্থাই করেননি। বিলেতে যদি কিঙ্কর সেনের চিঠিটা পাঠিয়ে দিতেন তাহলেও একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেন ত্রিদিব সেন। কিন্তু হায় তিনি কিছুই জানেন না!

বিলেত থেকে ফিরে এসে পিতামহের ঘরে দেওয়াল আলমারির মধ্যে চিঠির গাদার ভেতর চিঠিটা পেয়েছিলেন।

এলাহাবাদের বাড়িতে এতকাল ছিল ভৃত্য রামহরি। পিতামহের খুবই বিশ্বস্ত। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ত্রিদিব সেন।

রামহরি বলেছিল,—কর্তাবাবুর তখন খুবই অসুখ। যে লোকটা চিঠি নিয়ে এসেছিল সে জাতিতে ভুটানী। চিঠিটা কর্তাবাবুকে দিয়ে কি যে বললে কিছুই বুঝিনি বাপু। তবে চিঠি ছাড়া অন্য কিছু দেয়নি। লোকটা চলে যাওয়ার দু'দিন পরে বাড়িতে পুলিস এসে কর্তাবাবুকে নানান জেরা করেছিল। পুলিস চলে

যাওয়ার পর কর্তাবাবু বলেছিলেন, যে লোকটা এসেছিল তাকে রেল ইস্টিশনে কারা যেন গুলি করে মেরেছে।

ত্রিদিব সেন পিতৃবন্ধু অমিয়রঞ্জন দেকে রামহরির কথা বলতে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন,—লোকটা যখন মারা গেছে তখন আর কোন আশা নেই। ম্যাপটা থাকলে নাহয় বলতে পারতাম তোমার বাবার মৃতদেহটা কোথায় কোন্ গুহায় পাওয়া যাবে।

অমিয়রঞ্জন দে ত্রিদিব সেনকে বলেছিলেন তাঁর পিতা কিঙ্কর সেন কেন হিমালয়ের দুর্গম পথে পথে ঘুরছেন। কেন হুনান প্রদেশে গিয়েছিলেন। কেন ইতিহাসের অন্ধকার পথ হাতড়ে তিনি জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

ত্রিদিব সেন হতাশ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে এসেছিলেন এলাহাবাদে।

বার বার পিতার শেষ চিঠিটা পড়েছেন আর হাহুতাশ করেছেন। হিমালয়ের কোন্ গুহায় অসহায়ভাবে বন্দী হয়ে ছিলেন কিঙ্কর সেন কে জানে!

কত আশা নিয়ে তিনি পুত্রকে চিঠি লিখেছিলেন। পুত্র আসবে তাঁকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু চিঠিটা প্রায় তিন বছর পর ত্রিদিব সেনের হাতে পড়ল।

এতদিন নিশ্চয়ই কিঙ্কর সেন বেঁচে নেই।

* * *

সেই থেকে ত্রিদিব সেন অন্য মানুষ।

পিতার পথই তিনি অনুসরণ করলেন। হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন ভুটানে।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতের দরজায় এসে গেছে। চারদিকে ফিফ্‌থ কলামিস্ট।

ভুটান ছেড়ে সেই সময় ত্রিদিব সেন চীনদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু মাঝ-পথে চীন সরকার বাদ সাধলেন। ত্রিদিব সেনের চীনদেশের অভ্যন্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। তবু তিনি দমলেন না। গুপ্তপথে ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন হুনান প্রদেশে। সেখানে কার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কে তাঁকে তাঁর পিতার সন্ধান দেয় জানা যায়নি।

প্রায় পাঁচ বছর পথে পথে ঘুরেছেন তিনি। তাঁর পিছনে হন্যে হয়ে চৈনিক পুলিস ঘুরেছে তবু ধরা পড়েননি তিনি। শেষে ১৯৪৮ সালে ত্রিদিব সেন ফিরে এলেন স্বদেশে—প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে কলকাতার জাদুঘরে কাজ করতে লাগলেন।

যোধপুর পার্ক বলে তখন কিছু ছিল না। ত্রিদিব সেন মাঠের মাঝে একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ি করে বাস করতে লাগলেন।

সৃষ্টিছাড়া মানুষ। প্রাচীন লিপি ও মুদ্রা কত যে যোগাড় করেছেন তার হিসেব নেই।

ভ্রমর সিং কবে কেমন করে এই সৃষ্টিছাড়া মানুষটার কাছে আশ্রয় নিল কেউ জানে না। ১৯৪৮ সালে ত্রিদিব সেন যখন স্বদেশে ফিরে আসেন সেই সময় ভ্রমর সিং সঙ্গে ছিল।

১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ত্রিদিব সেন জাদুঘরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন বটে তবে প্রত্যেক শীতে অর্থাৎ নভেম্বর, ডিসেম্বর আর জানুয়ারীতে তিনি ভুটানে যান। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে কালিমপং থেকে ইয়াকের পিঠে চড়ে, কখনও বা পায়ে হেঁটে চলে গেছেন তেইশ হাজার তিনশো পঁচাশি ফুট উঁচুতে 'গাসা দঞ্জ' নামক একটি স্থানে। ভ্রমর সিং তাঁর সঙ্গে যেত।

আরও কতকগুলো লোক তাঁর সঙ্গে থাকে। তাদের বেশীর ভাগ লোকই ব্যবসায়ী।

* * *

১৯৫৯ সালের নভেম্বরেও গিয়েছিলেন তিনি। এবার গাসা দঞ্জ পেরিয়ে খাম্বা দঞ্জ হয়ে গ্যাংস্তি সিগাস্তি হয়ে তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। চীনা সৈন্য তিব্বতে ছেয়ে আছে। তাদের অত্যাচারে সারা দেশ জর্জরিত।

ছদ্মবেশে গিয়েছিলেন ওঁরা।

অতি সাবধানে···

পনের দিন লাসায় থেকে রাতের অন্ধকারে প্রফেসর সেন, ভ্রমর সিং আর দুজন তিব্বতী বাইশ হাজার নশো পঁয়ষট্টি ফুট উঁচুতে ড্রাই সল্ট লেক 'চোমো

গ্যাংগারে' গিয়েছিলেন···সেখানে কয়েকজন তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম-যাজকের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে ফিরে আসেন।

স্বদেশে ওঁরা ফিরে এসে-ছিলেন জানুয়ারীর শেষে···

তার পর থেকেই প্রফেসর ত্রিদিব সেন ও ভ্রমর সিংএর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আসে।

দুজনেই সঙ্গে রিভলভার রাখতেন সব সময়। প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে ফেলতেন। বাড়িতে কেউ এলে আগে ভ্রমর সিং যেত। যমদূতের মত দাঁড়িয়ে থাকত আগন্তুকের কাছে।

ত্রিদিব সেনের হাতের রিভলভারটা গর্জন করে উঠেছিল। [পৃষ্ঠা ২০

এমন কি ছাত্রদেরও রেহাই ছিল না। সন্ধ্যার পর জাদুঘরের চত্বরে অতি মৃদু শব্দ হলেই ভ্রমর সিংএর গর্জন শোনা যেত—শুনতা হুঁ! হুঁশিয়ার—

গেটের দারোয়ানের ওপর নির্দেশ ছিল সন্ধ্যার পর কোন লোক যেন বিনা অনুমতিতে জাদুঘরের দোতলায় যাবার পথ না পায়।

অথচ সে রাত্রে চারজন দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে আগন্তুক চীনা লোকটা যে কেমন করে গেল সেইটেই আশ্চর্য।

প্রফেসর সেন টেলিফোনে পুলিসকে খবর দিতে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থেকে পুলিস ছুটে এল···

জাদুঘরের প্রত্যেকটি আলো জ্বলে উঠল।

কলকাতার অধিবাসীরা কিছুই জানল না। পুলিস জাদুঘরের প্রত্যেকটি ঘর অনুসন্ধান করে আগন্তুকের পক্ষে অত রাত্রে জাদুঘরের ভেতরে প্রবেশ করার পথ আবিষ্কার করল। পিছনের দিকের একটা কাঁচের জানালার সার্সি ভেঙে প্রবেশ করেছিল সে।

লোকটা যে একা ছিল না তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কেন লোকটা জাদুঘরে এল, কেন প্রফেসর ত্রিদিব সেনকে আক্রমণ করতে গেল তার কোন কারণ খুঁজে পেল না পুলিস। লোকটা যদি জাদুঘর থেকে কোন মূল্যবান দ্রব্য চুরি করত তাহলেও না হয় কারণটা অনুমান করা যেত।

কিন্তু তাও না।

প্রফেসর ত্রিদিব সেনকে হত্যা করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যর্থ হয়ে আগন্তুক যখন পালাচ্ছিল তখনই ত্রিদিব সেনের হাতের রিভলভারটা গর্জন করে উঠেছিল। তারপরই ঘটল সেই মর্মান্তিক ব্যাপার।

* * *

রাতারাতি মৃতদেহ মর্গে পাঠান হল।

আহত ভ্রমর সিং গেল হাসপাতালে। তার বাম বাহুর মাংসল পেশী ভেদ করে বুলেটটা বেরিয়ে গেছে…

পুলিসের সঙ্গে প্রফেসর সেনকে যেতে হল লালবাজারে।

ভোর হয়ে গেল।

জাদুঘরের গেটে পুলিস পাহারা দেখে অনেকেই সেদিন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাটা কাউকে জানতে দেওয়া হল না।

বেলা-দশটা বাজতে ছাত্রেরা এল।

তাদের বলা হল গত রাত্রে একদল চোর হামলা করেছিল বলেই পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে। সুপারিনটেণ্ডেন্ট নোটিশ টাঙ্গিয়ে দিলেন: অনিবার্য কারণবশতঃ সাত দিন জাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বন্ধ থাকবে।

ছাত্রের দল ফিরে গেল। সকলের মুখে এক কথা—প্রফেসর টি. এস. কোথায়?

(ক্রমশঃ)

বই কেনার পাগলামো

জীবন ভৌমিক

পৃথিবীতে এক-একজন বড় অদ্ভুত মানুষ থাকেন। যেমন অদ্ভুত তাঁদের খেয়াল, তেমনি বিচিত্র তাঁদের নেশা। তোমাদের কাছে আজ এমনই একজন মানুষের গল্প বলব।

দেড়শো বছরেরও আগেকার কথা। লণ্ডন শহরে রিচার্ড হেভার নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি ছিলেন লাখ লাখ টাকার মালিক, তায় আবার বিয়ে-থা করেননি। একা মানুষ—মুক্ত পুরুষ।

রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পুরোনো বইয়ের দোকানে একটা কবিতার বইয়ের দিকে নজর পড়ল হেভারের। মনে পড়ল তাঁর এক বন্ধু অনেক টাকা দিয়ে বইটা কিনতে চেয়েও বিফল হয়েছিলেন। কারণ ঐ বই বাজারে দুষ্প্রাপ্য ছিল। রিচার্ড হেভার দু' শিলিং দিয়ে সেই পুরোনো বইটা কিনে নিলেন। সেই থেকে ভদ্রলোককে একটা নেশায় পেয়ে বসল। নানা জাতের পুরোনো বই কেনার নেশা। পাগলের মত তিনি খালি বই কিনে যেতে লাগলেন। ইংরেজীতে এই ধরনের বই কেনার পাগলামোকে 'বিবলিও ম্যানিয়া' বলে।

হেভার হয়ত খবর পেলেন, একশ মাইল দূরে এক শহরে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুরোনো বই বিক্রী হচ্ছে। ব্যস, হেভার সেখানে গিয়ে উপস্থিত। মাত্র একখানা বইয়ের জন্যে দু'শ মাইল রাস্তা যেতেও পরোয়া করতেন না। সামান্য টাকা দিয়ে আজকাল অনেক বই কিনতে পাওয়া যায়। আবার এমন বইও আছে যা সমস্ত পৃথিবীতে মাত্র দু' তিন কপি বর্তমান—কোনওদিন সেই বই আর ছাপা হবে না। বই-পাগলা হেভার এই রকম বইয়ের জন্যে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন এবং দু' তিন কপিই একসঙ্গে কিনে নিতেন, যাতে অন্য কারও কাছে এই বই না থাকতে পারে, কেবল মাত্র তাঁর কাছেই থাকবে! শুধু ইংরেজী বই নয়, নানা ভাষায় নানা জাতের বই। কেবল বই আর বই। খাওয়া নেই, ঘুম নেই—বুড়ো বয়সে তিনি কেবল বই কিনে যেতে লাগলেন। কিন্তু—

এত বই রাখবেন কোথায়! লণ্ডন শহরে তাঁর নিজের প্রকাণ্ড বাড়িখানা বইয়ে ঠাসা হয়ে গেল। এমন কি রান্নাঘর এবং সিঁড়ি পর্যন্ত। শেষে অবস্থা এমন হল যে তাঁর বাড়িতে তাঁর নিজেরই স্থান হল না। কারণ, সব ঘরগুলো কড়িকাঠ পর্যন্ত বই বোঝাই।

বই-পাগলা বুড়ো হেভার কিন্তু থামলেন না। মফস্বলে তাঁর যে দুখানা বাড়ি ছিল, এবার সেখানে বই ঠাসতে আরম্ভ করলেন। এবং বিশ্বাস কর, সেই দুখানা বাড়ি ভরতি হয়ে যাবার পর তিনি একখানা নতুন বাড়ি কিনলেন শুধু বই রাখবার জন্যে।

তবে সবচেয়ে মজার কথা কি জানো? রিচার্ড হেভার নিজে কোনও-দিন কোনও বইয়ের একটা পাতা উলটিয়েও দেখেননি। শুধু কেনা আর ঘর বোঝাই করতেই ছিল তাঁর আনন্দ। সারা জীবনে ভদ্রলোক প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার বই কিনেছেন।

হেভারের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত বই নিলাম করা হয়েছিল এবং দেড়লাখ বই বিক্রী হতে সময় লেগেছিল ছ' বছর।

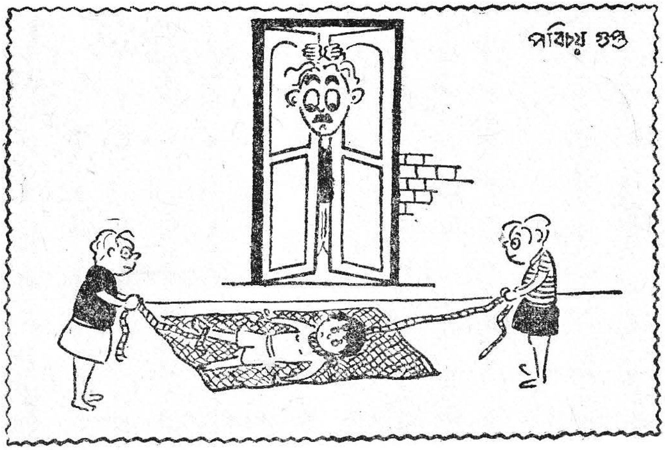

টেনে এমন লম্বা করে দে যাতে ছোট বলে কারুর আদর পেতে না পারে।

যারা ভোলে না

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

চ্যালা কাঠ নিয়ে সৎমা তাড়া করেছিল তাকে

সাতটার লোকালই সুবিধে। বন্ধুর বাড়িতে খেয়েদেয়ে আবার সাড়ে ন'টায় ফিরতি ট্রেন পাওয়া যাবে ওদের স্টেশনে। গেট বন্ধ হবার আগেই ঢুকে পড়া যাবে বৌবাজারের মেসে।

তিলজলার কারখানা থেকে বৃন্দাবন ছ'টার আগে ফিরতে পারে না কোনদিন। তারপর কখনই বা একটু নাইবে, কখনই বা ফরসা জামা কাপড় পরবে, আর কখনই বা পোড়া পেটে যা-হোক কিছু দেবে! কমসে-কম দশটা মিনিট আগে ত স্টেশনে পৌছোনো চাই! টিকিট কিনতে হবে ত! সাত বছর আগে হলে ঐ ঝামেলাটা পোয়াতে হত না। তখন সকাল সাতটায় কোলকেতায় আসা, সন্ধ্যে সাতটায় বাড়ি ফেরা—এর জন্য তাকে টিকিট কাটতে হয় নি কোনদিনও। ও ছিল তখন হকার। সাবান ফিরি করত গাড়িতে। বারো মাস ত্রিশ দিন। গাঁয়েতেই সাবানের কারখানা গজিয়েছিল একটা। বাবা রোজ বিকেলে মাল এনে রাখত সেখান থেকে।

বারো বছর যখন বিন্দাবনের বয়েস, তখন থেকেই শুরু। সৎমা বলে দিলেন—"ইস্কুলে পড়ে কী হয়? আর ইস্কুলের খরচাই বা আসছে কোথা থেকে? বারো বছরে আমার মামাতো ভাইয়ের ঘাড়ে সংসার পড়েছিল, সে ঠিক চালিয়ে দিয়েছে। তোমায় আর কিছু করতে হবে না, নিজের পেটটা চালাও।"

সেই থেকে শুরু। পাক্কা দু' বছর; ঝড় নেই, বাদলা নেই, বজ্রপাত নেই, বিন্দার সাবান ফিরি করা বন্ধ হয় নি।

তারপর বন্ধ হল। বিন্দা পান্তো খেয়ে বেরুতো রোজ সকালে। এক বাটি পান্তো ভাগ করে খেত সে আর তার পোষা কুকুর ভগলু। ক'দিন থেকে তাতে ভাগ বসাতে শুরু করেছিল বিন্দার সতাতো ভাই মথুরা। ছেলেটা হ্যাংলা। বিন্দা জানে সে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র সৎমা তাকে এককোঁচড় মুড়ি মুড়কি ধরে দেবে এক্ষুনি। তারপর সে গিয়ে বসবে বাপের তেলেভাজার দোকানে। এবেলা চারখানা, ওবেলা চারখানা তেলেভাজা মথুরার বরাদ্দ। এসবের উপর ভাত ত' আছেই! কোনদিন তিনবার, কোনদিন চারবার।

তাতে আপত্তি ছিল না বিন্দার। যার মা আছে সে চারবার ভাত অবিশ্যি খাবে। তা বলে, যার মা নেই তার অন্ততঃ পেট ভরে পান্তোটা ত' পাওয়া চাই সকালবেলায়! সারা দিনের ভিতর আর ত' সে খেতে আসছে না! বিক্রী থেকে চার পয়সা পর্যন্ত সে খেতে পারে এই রকম বন্দোবস্ত আছে। তাতে সে চা বিস্কুট খাক বা সন্দেশ রসগোল্লা খাক। ভাত? সে সেই রাত্রে বাড়িতে ফিরে।

তাই, পর পর তিন দিন মথুরাকে পান্তোর প্রায় অর্ধেকটা ধরে দিতে বাধ্য হবার পর সে নালিশ করেছিল সৎমার কাছে। "এই করটি পান্তো—এর যদি আবার মথুরাকে ভাগ দিতে হয়—" কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছিল সে। তারপর আর কিছু সে বলতে পারে নি। চ্যালা কাঠ নিয়ে সৎমা তাড়া করেছিল তাকে। "কুকুরটাকে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলাতে পারিস বজ্জাত ছেলে, আর ভাইকে এক গরাস ভাত দিতে হলে বুক ফেটে যায়! বেরো, বেরো বলছি আমার বাড়ি থেকে—"

বেরিয়েই এসেছিল বিন্দাবন। আর ফেরে নি। দীর্ঘ সাত বছর কেটে গিয়েছে। তিলজলার সাইকেল কারখানায় আজ সে নামকরা মিস্ত্রী। দেড়শো' টাকার মত তার ফি মাসে রোজগার। সাত বছর আগে সে ছিল বালক বিন্দাবন, আজ সে যুবক বৃন্দাবন মিস্ত্রী, ধোপদুরস্ত কাপড় পরে মাথায় টেরি বাগিয়ে যখন চায়ের দোকানে ঢোকে, তখন সে ছেলে বুড়ো সবাইয়ের কাছেই বৃন্দাবনবাবু। তার বন্ধু আছে ডজন ডজন, তারই একজন তাকে আজ বিশেষ করে অনুরোধ করেছে তার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে হবে রাত্তিরবেলায়; ভাইপোর অন্নপ্রাশন না কি একটা উপলক্ষ আছে সেখানে।

বিন্দাবন যখন পালাল সেই সাত বছর আগে, সৎমা ক্ষ্যামদা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। উঃ—আপদ বলে আপদ! সংসারটা জুড়ে বসে ছিল যেন! এখন একটু হাত-পা মেলে বাস করা যাবে। মথুরা ছেলেটা যেন বিন্দার আওতায় পড়ে বাড়তেই পারছিল না। এইবার নেচেকুঁদে বেড়াক, গায়ে গত্তি লাগুক একটু!

রামকান্ত—বিন্দার বাপ—নিশ্চুপ একেবারে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে একবার চারদিকে তাকায়—বাড়িটাকেই যেন একবার জিজ্ঞাসা করে—"হ্যাঁরে, তোর বিন্দা আসে নি?" জবাব না পেয়ে চুপ মেরে যায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, বিন্দার নামও মুখে আনে না।

বাইরে বাইরে অবিশ্যি সে ছেলের খোঁজ করেছিল বছরখানিক পর্যন্ত। গাড়ির হকারদের ধরে ধরে বলত—"ছেলেটা কোথায় গেল, দেখো না একটু খুঁজে! ঐ যে তোমাদের সাথে সাবান ফিরি করত গাড়িতে!" গাঁয়ের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের খোশামোদ করত—"শহরের পথেঘাটে একটু নজর রাখবেন বাবু গো! ছেলেটা যদি কখনো চোখে পড়ে!"

বছরখানিক চলল এইরকম। তারপর রামকান্তও ভুলল, ক্ষ্যামদাও ভুলল। বিন্দাবন বলে একটা ছেলে যে এ বাড়িতে ছিল, তা মনেও পড়ে না কারও।

ভুলল সবাই, একজন ছাড়া।

সে-একজন ভগলু। বিন্দার কুকুর।

গরীবের ঘরের কুকুর, গরীবানা চেহারা তার। হ্যাংলা, পাঁজর-বারকরা, ভয়ে ভয়ে তাকায়, ভয়ে ভয়ে চলে। নিজের বাড়িতে কখনো কেউ তাকে খাবার দেয় না, পরের দোরে এঁটোকাঁটা খেয়েই বাঁচে। তবু এইটাই তার নিজের বাড়ি, কারণ দশবছরের ছেলে বিন্দা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে এই বাড়িতেই তুলেছিল একদিন। এতটুকু ছোট্ট একটু বাচ্চা—কালোয় সাদায় গায়ের রং, কপালে সাদা একটু ফুটকি, আর লেজের ডগায় সাদা একগোছা লোম। দেখতে তখন মন্দ ছিল না। নিয়মমত খেতে পেলে বয়সকালে চেহারা ভালই দাঁড়াত হয়ত। কিন্তু খেতে সে পাবে কোথা থেকে? তার মনিব যে বিন্দা, সে নিজেই ত' পেট ভরে খেতে পায় নি কোন দিন। সকালে বিন্দার পান্তোর আদ্ধেক, রাতে বিন্দার ভাতের সিকি আন্দাজ—এই ছিল সাবেক দিনের বরাদ্দ। আর এখন? এখন বাইরে যা খুঁটে খেতে পারে। এ বাড়িতে একদানা ভাতেরও পিত্যেশ নেই ভগলুর। ক্ষ্যামদা তাকে দেখলে তাড়া করে, আর মথুরাকে দেখলেই সে নিজে থেকে পালায়। রামকান্ত? না, রামকান্তর সঙ্গে দেখা হয় না ভগলুর। কারণ, দুজনে ওরা একসঙ্গে বাড়িতে থাকে না কোনও সময়—এক সেই গভীর রাত্রে ছাড়া। তা, গভীর রাত্রে রামকান্ত থাকে ঘরের ভিতর, আর ভগলু থাকে বাইরের উ ানে খড়গাদার নীচে।

ঐ খড়গাদার নীচে ভগলুর চিরদিনের আড্ডা। মাচার উপর খড়ের পাঁজা, মাচার তলায় বেশ টানটান হয়ে শোবার জায়গা আছে ভগলুর। বৃষ্টি হলে জল পড়ে না, রোদ্দুর হলেও ওখানে

মাঝে মাঝে গায়ের উপর দিয়েও চলে যায় তারা…

তা পৌঁছোয় না। ও জায়গায় একটুমাত্র অসুবিধে; সাপের গর্ত আছে ওখানে। তা, তাতে আর ভয় কী? সাপেদের সম্বন্ধে ভগলুর দার্শনিক উপেক্ষা আছে খানিকটা। কামড়ায় যদি, কামড়াক। প্রাণ রাখতে দৈনিক এই যে প্রাণান্ত, তাতে যদি ওরা দাঁড়ি টেনে দিতে পারে একটি কামড়ে, তাতে আপত্তি নেই ভগলুর।

সাপেরা কিন্তু ওকে প্রতিবেশী বলে মেনেই নিয়েছে যেন। মাঝে মাঝে ওর গায়ের উপর দিয়েও চলে যায় তারা, কিন্তু কামড়ায় না। ভগলুই বরং বিরক্ত হয়ে 'ভৌ-ভক্' বলে তর্জন করে ওঠে তাদের—তারা সুড়সুড় করে পাশ কাটিয়ে যায়—বোধহয় আপনমনে মুচকি হেসে।

তা, শোবার সময় ছাড়া বাড়িতে বড় একটা থাকে না ভগলু। একবার ভোরবেলায় সে ভিতরের বারান্দায় ওঠে। যেখানটায় বিন্দার সঙ্গে বসে সে পান্তো ভাত খেত সেকালে, সেইখানটায় বসে একটিবার। তারপর, মিনিট দুই চুপচাপ বসে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করে। তারও পরে, একটা কাতর 'ভৌ-উ-উ' শব্দে নিজের মনের দুঃখটা হাওয়ার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ক্ষ্যামদা ও-সময়টা পুকুরঘাটে থাকে রোজই, আর মথুরা ও-সময়ে ঘুম থেকেই ওঠে না। কাজেই তার এই রোজকার বারান্দায় ওঠা-নামার কথা জানতেই পারে না শত্রুপক্ষ।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই সারা গ্রামটা সে ঘুরে আসে একবার। কোন বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার

বিশেষ আয়োজন আছে কি না, এইটে খোঁজ নিয়ে আসে। ও টের পায়। জালে কোথাও মাছ ধরা হচ্ছে কি না, কারও আমগাছের ডালে পাঁঠার দুই পা বেঁধে ঝুলন্ত ধড়টা থেকে চামড়া ছাড়ানো হচ্ছে কি না, কারও রান্নাঘরের বারান্দায় সমারোহ করে একাধিক শিলে হরেক রকম বাটনা বাটা হচ্ছে কি না, ও খবর পায় ঠিক সময়। তারপর, দুপুরের পরেই ও হাজির সেই বাড়ির পিছনটাতে।

যেদিন গাঁয়ের কোথাও ওরকম কিছু থাকে না, সেদিন ওর হাঙ্গামা বেড়ে যায় অনেকখানি। একসঙ্গে বহু ফ্রন্টে লড়তে হয় ওকে। অন্ততঃ দশটা বাড়ি না ঘুরলে পেটের অর্দ্ধেকটাও ভরে না। ও একা ত' নয়! অনেক কুকুর আছে গাঁয়ে। তারা অবিশ্যি ভগলুর মত এত বেওয়ারিস নয়। যে-বাড়ির আশ্রিত, সে-বাড়ি থেকেই নিয়মিত কিছু মেলে তাদের। তবু তারা উপরি-পাওনার লোভে অন্য বাড়িতে হানা দিতে ছাড়ে না। এদের সঙ্গে রীতিমত কাড়াকাড়ি করতে হয় ভগলুকে।

আড়াই পহর বেলায় খাওয়ার লড়াই শেষ করে ভগলু এসে খড়গাদার নীচে ঘুমোয় সন্ধ্যে পর্যন্ত। তারপর ধড়মড় করে উঠেই ছুট দেয় স্টেশনের দিকে।

হ্যাঁ, রোজ সন্ধ্যেবেলা ওর বাঁধা ডিউটি রয়েছে। সাতটার লোকাল যখন স্টেশনে আসবে, হাজির থাকতেই হবে ভগলুকে। ঐ ট্রেনে ওর বিন্দাবন ফিরত শহর থেকে। সেই সাত বচ্ছর আগে। তখন রোজ ভগলু আগু বাড়িয়ে আনতে যেত মনিবকে। গাড়ির সময়টি মুখস্থ ছিল ওর। ঠিক ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে গাড়িটিও এসেছে, স্টেশন গেটের পিছনে ভগলুও এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর গাড়ি থামবে, গেট দিয়ে পিলপিল করে বেরুবে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল, তারের বেড়া ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে ভগলু, যতক্ষণ না সবাইয়ের শেষে বেরিয়ে আসবে বিন্দাবন আর অধর—এ স্টেশনের জোড়া হকার। বিন্দাবনকে দেখেই 'ভৌ-উ-উ' করে লম্বা একটা ডাক দিয়ে ভগলু ঝাঁপিয়ে পড়বে তার গায়ের উপর, তার পর তার পায়ের তলায় এক লম্বা গড়াগড়ি দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবে, পথ দেখিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

সাত বচ্ছর আগে এই ছিল ভগলুর রোজকার সন্ধ্যেবেলার রুটিন। এখনও ঐ রুটিনই চলছে, একটুখানি অদলবদল করে। ডেলি প্যাসেঞ্জারের ভিড় যতক্ষণ না কাটে, ভগলু এখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তারের বেড়া ঘেঁষে। কিন্তু তার পরই গেটের দিকে একবার তাকিয়ে সে 'ভৌ-উ-উ' বলে যে ডাকটা ছাড়ে, সেটা আগের মতন উপচে-পড়া আনন্দের ডাক নয়। সে-ডাক যে শোনে, সে থমকে দাঁড়িয়ে কুকুরটার পানে তাকায় একবার; তার ভয় হয় কুকুরটার পাঁজরার হাড় ভেঙে বেরুচ্ছে বুঝি ঐ ডাকের সঙ্গে।

তারপর—মাটিতে গড়াগড়ি সে আর দেয় না এখন। তার বদলে পিছনের পা ভেঙে সামনের পা উঁচু করে ঝিম ধরে সে বসে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর উঠে ধীরে ধীরে দেহটাকে টানতে টানতে

কোনমতে গিয়ে পড়ে রাস্তায়—লেজটা নেতিয়ে পড়ে ঝাঁট দিতে দিতে যায় রাস্তার ধুলো। না গেলে নয়, তাই যাওয়া! না বাঁচলে নয়, তাই বাঁচা! তা নইলে ঘরে যাওয়া বা বেঁচে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ভগলুর।

আজ সাত বছর নিত্যি সন্ধ্যায় চলছে এইরকম। ডেলি প্যাসেঞ্জার, স্টেশনের বাবুরা সবাই চেনে ওকে। সবাই জানে ওর দুঃখের কথা। ওকে কেউ তাড়া দেয় না, ওর 'ভৌ-উ-উ' ডাকে মন খারাপ হয়ে গেলেও ও আর না আসুক এ কামনা কেউ করে না।

সাত বছরে ভগলুর পরিবর্তন কিছু না হোক, অনেক কিছু বদলে গিয়েছে রামকান্তর বাড়িতে। পর পর কয়েক সাল অজন্মা, ধান ওঠেই না জমিতে। দেহ অচল বলে তেলেভাজার দোকানেও আর বসতে পারে না রামকান্ত। মথুরা চলে গিয়েছে যাত্রার দলে; রোজগার হয়ত কিছু করে, কিন্তু নিজের বাবুগিরিতেই তা শেষ হয়ে যায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, গলা কাঁপিয়ে অ্যাক্টো করা ছাড়া আর কিছুই করে না।

আর ক্ষ্যামদা? উপোষ দিয়ে দিয়ে তার চেহারা দাঁড়িয়েছে শাঁকচুন্নীর মত। তবে স্বভাব কিছু বদলায় নি বোধহয়। এখনও ভগলুকে দেখলেই চ্যালা কাঠ ছুঁড়ে মারে তাকে।

* * *

উঃ, কী তাড়াতাড়িটাই করতে হল বিন্দাবনকে! টেরিটা মনোমত করে বাগানো হল না, হল না দোকানে গিয়ে দুখানা চপ কাটলেট খেয়ে নেওয়া। সাতটা পাঁচে লোকাল ছাড়বে; ছ'টা পঁয়ত্রিশ এখন। রিকৃশা ডেকে স্টেশনে ছুটল বিন্দা; টিকিট কিনে উঠতে পারলে হয় গাড়িতে!

পেরে গেল! ডেলি প্যাসেঞ্জারেরই গাড়ি এটা, ছুটকো টিকিট কমই বিক্রী হয়। বুকিং অফিসের জানালা ফাঁকাই একরকম।

গাড়িতে এসে জায়গা দখল করে বসল যখন, তখনও দশ মিনিট সময় হাতে আছে। পেটের ভিতর চাঁ চাঁ করছে; প্ল্যাটফর্মেই চলন্ত মিষ্টির দোকান। বিন্দাবন ডাকল গাড়িখানাকে। আনা আষ্টেকের মিষ্টি কিনে ফেলল। গাড়ি ছাড়লেই খেয়ে নেবে এটা। তারপর, জল? গাড়িতে গাড়িতে সোডা লেমনেড হাঁকছে অনবরত; জল নাই বা পাওয়া গেল!

গাড়ি ছাড়ল।

সবে খাবারের ঠোঙাটি খুলতে গিয়েছে বিন্দাবন, ও-কোণ থেকে হেঁকে উঠল এক ছোকরা —"বিন্দাবনবাবু যে! তারপর আমার কী করলেন, বলুন। যাচ্ছেন কোথায়?"

বাহুবলে ভিড় ঠেলে ও-কোণ থেকে এ-কোণে এসে হাজির হল ছোকরা। তিলজলার সাইকেল কারখানায় কাজের প্রার্থী ও।

বিন্দাবন যে একজন হেড মিস্ত্রী, তার যে হাত আছে চাকরির ব্যাপারে এসব জেনে

নিয়েছে ছোকরা। বিন্দাবনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে ও। কিন্তু বিন্দাবন ওকে নিতে চায় না। ছেলেটাকে সে পছন্দ করতে পারে নি। অতি ফাজিল, অতি বখাটে, একদম লক্কাপায়রা-মার্কা ছোকরা। এ ধরনের ছেলেরা পরিশ্রমী হয় না, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করে না, হাজার ঝামেলা বাধে এদের নিয়ে। তাই বিন্দাবন ওর চাকরি করে দেয় নি। বলেই দিয়েছে পষ্টো—"এখানে হবে না ভাই, অন্য চেষ্টা দেখ।"

কিন্তু ছোকরার অন্য গুণ না থাক, অধ্যবসায় আছে। বিন্দাবনকে সে ছাড়ে নি। যখন-তখন দেখা করে। বিরক্ত করে, ঘুষের লোভ দেখায়। বিন্দাবন অটল।

অধ্যবসায়ী ছোকরা অবশেষে আজ এই ট্রেনের ভিতর পাকড়ে ফেলেছে বিন্দাবনকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবেই সে। আজ আর ফুড়ুৎ করে কারখানার গেটের ভিতর ঢুকে পড়ে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। ও ত যাবে লক্ষ্মণপুর! এক ঘণ্টার রাস্তা। এই এক ঘণ্টায় সে চিঁড়ে ভেজাতে পারবে না? একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল ছোকরা।

একটি একটি করে মিষ্টি খাওয়াল বিন্দাবন। [পৃষ্ঠা ৩০

বিন্দাবনের মিষ্টির ঠোঙা হাতেই রইল। ওর সমুখে বসে খেতে রুচি হয় না যেন। সে ঠায় বসে ছোকরার বক্তিমা শুনতে লাগল। ঠাস করে ওর গালে একটা চড় বসিয়ে দেবার যে-ঝোঁক ক্রমে তার মাথায় চেপে বসছিল, সেটা দমন করতে থাকল অতিকষ্টে। মনে মনে কেবল ডাকে—"হে ভগবান্, কতক্ষণে শেষ হবে এ-যাতনার?"

স্টেশনের পর স্টেশন যাচ্ছে। এও একটা কী জানি কোন্ স্টেশন! বাইরের দিকে তাকাবার ফুরসত দিচ্ছে না ছোকরা। গাড়ি হুইশ্‌ল্ দিয়েছে—ছাড়ছে বুঝি! কী জানি কোন্ স্টেশন এটা!

হঠাৎ 'ভৌ-উ-উ'!

একটা কুকুর ডেকে উঠল কোথায়! মর্মভেদী ডাক! যেন ডাকের পর্দায় পর্দায় ওর এক-একখানা পাঁজরার হাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে বেরিয়ে আসছে!

ভৌ-উ-উ—

লাফিয়ে উঠল বিন্দাবন।

এ ডাক—এ ডাক ত' তার চেনা! কী জানি কি হয়ে গেল বিন্দার বুকের ভিতর—চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে সে লাফিয়ে পড়ল। এই ত'! এই ত' তার গাঁয়ের স্টেশন! ঐ ত'—ঐ ত'—গেটের ওপাশে, পিছনের পা মুড়ে, সমুখের পায়ে ভর দিয়ে ঝিম ধরে বসে আছে তারই ভগলু!

কী জানি কি হল! সাত বছর যে-ফল্গুর স্রোতের অস্তিত্বই টের পায় নি বিন্দাবন, তা হঠাৎ বালির চড়া ভেদ করে ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে এল তার দু'চোখ দিয়ে। সে ছুটে বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে—হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভগলুর উপরে।

ভগলু চমকে উঠল—ঘুরতে লাগল দিশেহারার মত, তারপর মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল বিন্দাবনের পায়ের তলায়। তারও পরে চার পা উঁচু করে চিত হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, দুটো চক্ষু দিয়ে ধারায় জল গড়িয়ে নামল ভগলুর।

তাকে আদর করে, তুলে বসিয়ে, একটি একটি করে মিষ্টি খাওয়াল বিন্দাবন। ঠিক যেমন করে কাছে বসে পান্তো খাওয়াত সাত বছর আগে।

খাওয়ার পরে ভগলু তার কাপড় কামড়ে ধরে টানতে লাগল। "চল, বাড়ি চল! আর তোমায় ছেড়ে দেব না।"

ব্যারোমিটারের গলদ

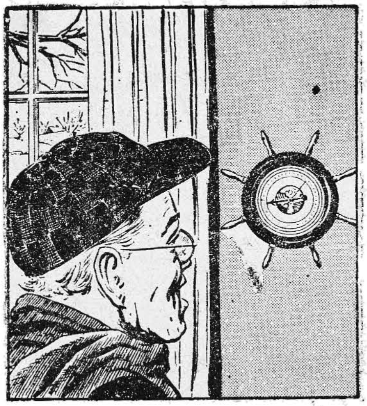

Barometer বা বায়ুমানযন্ত্র তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ। তার একটি ছবি এখানে রয়েছে। এই যন্ত্র দ্বারা আবহাওয়ার পরিমাপ করা হয়। আগামী ২৪ ঘণ্টা আবহাওয়া কিরূপ থাকবে তারও পূর্বাভাষ এতে পাওয়া যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ব্যারোমিটার দ্বারা গ্রীষ্মকালের চেয়ে শীতকালেই আবহাওয়ার খবর ভাল পাওয়া যায়। কারণ গ্রীষ্মকালে অনেক সময়েই বজ্রপাত সহ হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়। কোন কোন সময় ব্যারোমিটার যন্ত্রের পূর্বাভাষে তা ঠিকমত ধরা পড়ে না।

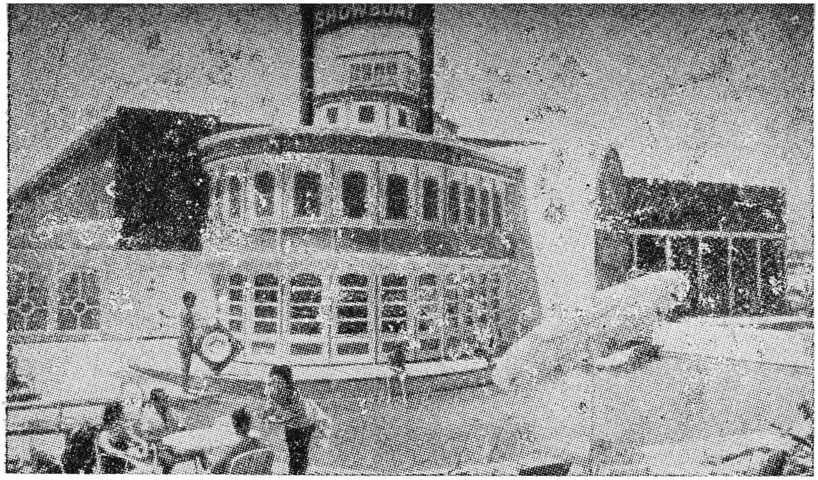

লাস ভেগাসের একটি হোটেল। শো-বোটের অনুকরণে তৈরী।

লাস ভেগাস

জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

আবার আমেরিকায় এসেছি। এবার নিয়ে সাতবার হল, কিন্তু কোনবারেই লাস ভেগাস (Las Vegas) শহরে আসিনি। প্রতিটি আমেরিকাবাসীর মনে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে যে জীবনে অন্ততঃ একবার লাস ভেগাস শহরে আসবে। নেভাদা মরুভূমির মধ্যে একটা নূতন প্রগতিশীল শহর গড়ে উঠেছে যা' বর্তমানকালে শুধুমাত্র আমেরিকার নয় 'সমগ্র পৃথিবীর প্রমোদগজতের রাজধানী' নামে স্বীকৃতি পেয়েছে। এতকাল ভাল স্টেজ-শো দেখতে হলে ছুটতে হত প্যারিসে অথবা নিউ ইয়র্কের -'ব্রডওয়ে' অঞ্চলে। কিন্তু আজকাল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শো দেখতে হলে এই লাস ভেগাসএ আসতে হবে।

হলিউড থেকে মোটরে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ। এখানে প্রতিটি বড় বড় চিত্রতারকা তাঁদের প্রমোদভবন তৈরি করেছেন। প্রতিটি বাংলো ধরনের বাড়িতে অলিম্পিক সাইজের 'সুইমিং পুল' রয়েছে, তাতে নীল জল ভরতি। আকাশ থেকে সে এক অপূর্ব দৃশ্য! আমেরিকা বলতেই আমাদের মনে হয় গগনচুম্বী শত শত স্কাইস্ক্রাপার বাড়ির সমাবেশ, কিন্তু এই লাস ভেগাসে কয়েকটি বড় হোটেল বাড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাড়িই প্রায় বাংলো ধরনের, এবং একতলা-দুইতলা-বিশিষ্ট। কাজেই এটা এদেশে নূতন বলে মনে হয়। রাস্তায় উজ্জ্বল নিওন ও রঙীন আলোর ছড়াছড়ি—পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের কোনও শহরে এত উজ্জ্বল আলোঝলমলে রাস্তা আমরা জীবনে এর আগে আর কখনও দেখিনি।

নেভাদা মরুভূমির যশোয়া গাছ। দেখতে ভারী অদ্ভুত।

এই শহরের লোক ছাড়াও বাইরে থেকে প্রতিবৎসর গড়ে পঁচিশ লক্ষ লোক এখানে বেড়াতে আসেন। এই শহরেই মোট বিশ হাজারটি হোটেল ও মোটেল রয়েছে। হোটেল আমরা চিনি—মোটরগাড়ি নিয়ে থাকার বিশেষ হোটেলগুলির নাম হচ্ছে মোটেল। এখানে এই মোটেলএর ছড়াছড়ি। রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার গাড়ি ছুটছে। রাস্তায় লোকেরা হেঁটে পথ চলে না—সবাইয়ের গাড়ি আছে। নানা-রংএর লম্বা লম্বা সুন্দর বাহারী গাড়ি ছুটেছে—কাল রংএর গাড়ি নাই বললেই চলে—পাঁচ হাজারে হয়ত একটি দেখতে পাওয়া যাবে।

এ শহরটা ভারী মজার—দিনে মৃতবৎ মনে হয় কিন্তু রাত্রিবেলায় উর্বশী সেজে ওঠে। এরা সবাই দিনে ঘুমায় আর রাত্রিবেলায় জেগে থাকে—আনন্দ করে। দোকানপাট সারাদিন সারারাত্রি খোলা থাকে।

এখানে অনেকগুলি থিয়েটার হল রয়েছে, তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ শোগুলি নিয়মিত অভিনয় করছে। প্যারিস থেকে 'ফলি বার্জে', 'ক্যাসিনো ডি পারী', এদেশের 'জিগফিল্ড ফলি', 'হেলো আমেরিকা', 'আইস রিভিউ' প্রভৃতি অসংখ্য বড় বড় 'শো' বর্তমানে চলেছে। এখানে সম্প্রতি ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে নূতন সুরম্য থিয়েটার তৈরী হচ্ছে। এর উদ্বোধন উপলক্ষে এদেশের বিখ্যাত চিত্রতারকা মিস শার্লী ম্যাকলীন (Shirley MacLaine) সম্প্রতি সারা পৃথিবী ঘুরে এলেন। এই

পি. সি. সরকার ও শার্লী ম্যাকলীন

শার্লী ম্যাকলীন এবং 20th Century Foxএর কর্মকর্তারা এবারে কলিকাতা নিউ এম্পায়ার মঞ্চে আমার 'ইন্দ্রজাল' দেখেছেন। ফলে আমি আমার কপি-রাইট-করা নূতন খেলা করাত কাটা, এক্স-রে, স্পুটনিক প্রভৃতি খেলা নিয়ে সদলবলে এরোপ্লেনে এখানে চলে এসেছি। আমাদের কয়েক টন মাল ইতিপূর্বেই এরোপ্লেনে পৌঁছে গিয়েছে। নূতন করে বিরাট সাইজের সিনসিনারী এঁরা তৈরি করছেন। আমাদের বিপরীত থিয়েটারে (প্রতিসপ্তাহে ৩৫ হাজার ডলার) বিখ্যাত Frank Sinatraর শো চলছে। আমরা শুভ উদ্বোধন রজনীতে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করবো। যদি প্রথম শ্রেণীর বিবেচিত হই তবে এক সপ্তাহ শো চলবে—নতুবা হয়ত পত্রপাঠ বিদায় নিতে হবে। তবে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে এক সপ্তাহ পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নিশ্চয়ই চলবে।

এই শহরের কাছেই রয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম হ্রদ Lake Mead, কুড়ি মাইল দূরে পৃথিবীর সবচাইতে উঁচু বাঁধ ও জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্র Hoover Dam, আমেরিকার বিখ্যাত বিমান-সৈন্যের ঘাঁটি Thunder Birdsএর কর্মক্ষেত্র এখানেই রয়েছে। এই শহরের পঁয়ষট্টি মাইল দূরে রয়েছে নেভাদা মরুভূমির মধ্যে এদেশীয় আণবিক বোমার পরীক্ষাক্ষেত্র।

এখানে এসে একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছি। কবির কথায় বলতে ইচ্ছা হচ্ছে—'যা দেখেছি তুলনা তার নাই।' সত্যি লাস ভেগাস বর্তমান জগতের Entertainment Capital of the World.

তেল চুরির রহস্য

(সত্য ঘটনা)

পূরবী দেবী

ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ডাইরেক্টররা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। রক্ষীর কাছে সংবাদ পেয়ে তেলের গুদোমে এসে তাঁদের চোখ ছানাবড়া। বড় বড় তেলভরতি ড্রামের মুখ কাল রাত্তিরে কে এসে সকলের অলক্ষিতে কেটে রেখে গেছে। কাটা মুখ দিয়ে সব তেল ড্রাম থেকে বেরিয়ে গেছে। উঠোনটা তেলে তেলাকার হয়ে ছোট্ট পুকুরের আকার ধারণ করেছে। তাঁরা তো ভেবে উঠতে পারেন না কে তাঁদের এমন শত্রু আছে যে শুধু তাঁদের ক্ষতি করার জন্যে প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত তেল নষ্ট করে দিয়েছে।

গুদোমের রক্ষীকে নানারকম প্রশ্ন করেও তাঁরা কোন হদিস পান না। সে যা বলে তাতে অপরাধী যে কে তাও বোঝা যায় না। সে বলছে, গত রাত্রে একটার সময় যখন সে টহল দিয়ে গেছে তখনও কোন ক্ষতি হয়নি। তারপর সে সদরে বসে

একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কেউ এসে এই সর্বনাশ করে গেছে। কারণ ভোর চারটের সময় টহল দিতে এসে দেখে ড্রামের মুখ দিয়ে হুহু করে তেল বেরিয়ে যাচ্ছে। বন্ধ করতে গিয়ে দেখে তেল বেরোবার কলের মুখ কাটা। বন্ধ করতে না পেরে সে তার চাচাকে ডেকে আনে। তার চাচা পাশের বার্মা অয়েল কোম্পানির রক্ষী। তার চাচাও তেল বেরোন বন্ধ করতে না পেরে মালিকদের খবর দিতে বলে। চাচার উপদেশ মত সে গিয়ে মালিকদের জানিয়েছে ব্যাপারটা।

ঘটনাটা খুবই ঘোরাল দেখে মালিকরা পুলিসে সংবাদ দেন। থানা থেকে একজন ইন্‌স্‌পেক্টর এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনিও কোন সূত্র খুঁজে পেলেন না। তখন অন্য কোথাও কোন হদিস পাওয়া যায় কি না জানবার জন্যে তিনি যে উঠোনে ড্রামগুলো রাখা ছিল সেখানটা পরীক্ষা করতে গেলেন।

সারা উঠোনের চারদিক কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। যেখানে রক্ষী সদরে পাহারা দেয় তার বিপরীতে পেছন দিকে কাঁটাতারের সার সার লাইনে কাঁটাতারগুলো জুড়ে এক করে ফেলে কে বেঁধে দিয়েছে। বুঝতে বাকি রইল না ইন্‌স্‌পেক্টরের যে এখান দিয়েই দুর্বৃত্ত উঠোনে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু সে বোঝাও ইন্‌স্‌পেক্টরের কাজে এল না। কারণ দুর্বৃত্ত ধরা না পড়া অবধি কোথা দিয়ে সে এসেছে, কেমন করে তেল বেরোবার কল কেটে দিয়েছে তা জেনে লাভ নেই।

ইন্‌স্‌পেক্টর পড়লেন মহামুশকিলে। এই দুষ্কার্যের নেতাকে ধরতে না পারলে, পাশাপাশি আরো তেলের গুদোম আছে, তাদেরও এই রকম ক্ষতি হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার লোকসান হবে।

কিন্তু ধরার উপায় কি　　কোন সূত্রই তো নেই।

তখন ইন্‌স্‌পেক্টর গিয়ে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন।

—আপনাদের ড্রামে কত তেল ছিল বলতে পারেন কি ?

—তা প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত।

—আপনাদের মাল কি ইনসিওর করা থাকে ?

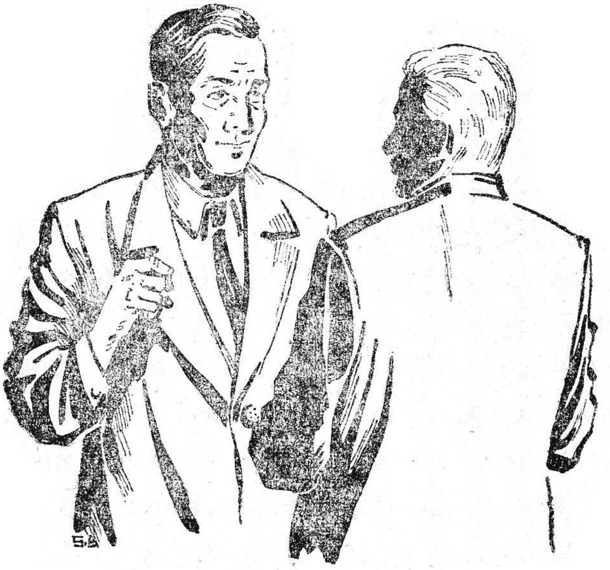

ইন্‌স্‌পেক্টর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। [পৃষ্ঠা ৩৫

—হ্যাঁ। তেলের ব্যাপার। যদি আগুন লেগে যায়। তাই ফায়ার ইনসিওর করা আছে প্রায় দু'লক্ষ টাকার মত।

—আচ্ছা, আপনাদের কোন শত্রু আছে, যাতে আপনাদের ক্ষতিতে তার আনন্দ হয়?

—না, সে রকম কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। আমাদের পাশে যে সব কোম্পানির গুদোম আছে তাদের নাম বার্মা শেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল। তাদের সঙ্গে আমাদের অবস্থার কোন তুলনাই হয় না। তাছাড়া তেল আমাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করতে হয়। আমাদের ক্ষতিতে তেলের দাম বাড়িয়ে তাদের লাভের সম্ভাবনা নেই।

এসব প্রশ্ন থেকেও ইন্‌স্‌পেক্টর কোন সূত্র আবিষ্কার করতে না পেরে হতাশ হয়ে পড়লেন কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কেউ এই সর্বনাশ করে গেছে।

কিন্তু কে সে আর কি তার উদ্দেশ্য?

এই কথা ভাবতে ভাবতে ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর অফিসে ফিরে এলেন। তারপর থেকে তিনি সদাই এই কথাই ভাবতে থাকেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে হয় যে, সাধারণতঃ বড় একটা দুষ্কার্য করার আগে ছোটখাট দুষ্কার্য করে সফল হলে অপরাধীদের মনে বড়রকমের দুষ্কার্য করার সাহস জাগে। তাহলে ওয়েস্টার্ন কোম্পানির তেল এইভাবে নষ্ট করে দেওয়ার আগে নিশ্চয়ই এই ধরনের ছোটখাট অপরাধ ঘটে গেছে। কথাটায় যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাই এই ধরনের ঘটনা আগে ঘটেছে কি না

জানবার জন্যে তিনি ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির এক ডাইরেক্টরকে ফোন করেন।

ডাইরেক্টর বললেন, শুনেছিলুম বার্মা অয়েল কোম্পানির তেলের ড্রামের মুখ একদিন রাত্রে খোলা পড়ে ছিল। তাতে তাদের বেশ খানিকটা তেল নষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তারা ভেবেছিল এটা তাদের কোন কর্মচারীর অবহেলায় ঘটেছে। তাই এ ব্যাপার নিয়ে কোন অনুসন্ধান হয়নি।

সংবাদটা পেয়ে ইন্‌স্‌পেক্টর তখনই বার্মা অয়েল কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর প্রশ্ন শুনে ম্যানেজার বললেন, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। তবে মোটে সাত আট হাজার টাকার মত মাল। ঝঞ্ঝাট পোয়াবার ভয়ে আমরা আর তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

—আচ্ছা, এর আগে কি কখনও তেল নষ্ট হয়েছে?

—না, আমাদের গুদোমে হয়নি। তবে…

—তবে?

—তবে এখান থেকে দু'মাইল দূরে কেলিওয়াদা প্রদেশে পাইপ লাইনের সংযোগের মুখ ঢিলে হয়ে তেল চুঁইয়ে পড়ে।

—তার মানে?

—মানে আর কিছু নয়। বন্দরে জাহাজে করে তেল এলে সেই তেল পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে ড্রামে এসে ভরতি হয়।

—একটু খুলে বলুন।

—আমাদের এই গুদোম বন্দর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। এই সমস্ত পথটার নীচে পাইপ জুড়ে জুড়ে বসানো আছে। জাহাজ থেকে তেল পাম্প করে ড্রামে পাঠিয়ে দেয়। সেই তেল পাইপের মধ্যে দিয়ে আসে। এই দীর্ঘ পাইপ লাইন কেলিওয়াদা প্রদেশ দিয়ে গেছে। সেখানে দুটো পাইপের জোড়ার মুখ মাঝে মাঝে ঢিলে হয়ে বেশ খানিকটা তেল চুঁইয়ে পড়ে।

—তা সেখানটা সারান না কেন?

—সারানো তো হয়, তবে কেন যে অকারণে ঢিলে হয়ে যায় তা বলতে পারি না।

—কতদিন এরকম ঢিলে হচ্ছে ?

—তা প্রায় দু'বছর হবে।

—চুঁইয়ে পড়া তেল যদি জমা হয়ে থাকে তাহলে তো হঠাৎ আগুন ধরে ভীষণ কাণ্ড হতে পারে। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি করেছেন ?

এইবার ম্যানেজার হেসে ফেলে বললেন, সে ভয় নেই। পাইপের নীচে ইটের সিমেন্টবাঁধানো দীর্ঘ নালা আছে। চুঁইয়ে পড়া তেল নালা দিয়ে গড়িয়ে একটা পাতকুয়ায় জমা হয়। প্রতিবছর ঠিকাদার সে তেল নেবার ঠিকা নেয়।

—তার মানে ?

—এই সব ঝড়তি-পড়তি তেলও বিক্রী হয়ে যায়। নষ্ট তেলের পাতকুয়া জমা নেবার জন্যে প্রতিবছর নিলাম ডাকা হয়। নিলামে যে বেশী দর দেয় তাকেই জমা দেওয়া হয়।

—কত টাকায় জমা পড়ে ?

—আজ থেকে আট বছর আগে প্রথম যখন জমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তখন দর উঠেছিল আটশ টাকা। এখন দু'বছর নিলামে জমা নেবার প্রায় ৬৫০০ টাকায় ডাক ওঠে।

—এখন কে ঠিকা নিয়েছে ?

—গুজরাট কলার কোম্পানি। তারা দু'বছরই ঠিকা নিচ্ছে।

—কত টাকা আন্দাজ লাভ পায় বলতে পারেন ?

—না, তা বলা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, আপনার উঠোনে যে ড্রামের মুখ খুলে তেল পড়ে গেল সেই তেলও কি নালা দিয়ে পাতকুয়ায় জমা হয়েছে ?

—তাছাড়া আর কোথায় যাবে বলুন।

—আচ্ছা, এই দুষ্কার্য কি ঠিকাদাররা করতে পারে ?

—আমার তো তা মনে হয় না। কারণ তারা থাকে বোম্বে শহরে। কেলিওয়াদা অঞ্চল থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে। তারা এ কাজ করলে কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।

এই সব জেরাতেও এমন কোন সূত্র পাওয়া গেল না যা থেকে ইন্‌স্পেক্টর

প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান পান। তখন তিনি ঠিক করলেন, গোপনে কেলিওয়াদা অঞ্চলে তদন্ত চালাবেন—যদি কোন সূত্র পান।

কেলিওয়াদা অঞ্চলে একদিন একজন দালালকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। সে অঞ্চলের লোকেরা খুব দুঃস্থ। কোন রকমে দিন এনে দিন চালান গোছের অবস্থা।

সেই সব লোকেদের মধ্যে লছমন নামে একটা লোককে খুব সচ্ছল বাবুয়ানী চালে চলতে দেখা যায়। লোকটা হঠাৎ সচ্ছল হয়ে ওঠায় তার প্রতিবেশীদেরও দৃষ্টি তার উপর এসে পড়ে।

লোকের ঘরে ঘরে কি জিনিস দরকার খোঁজ নিতে নিতে একদিন সেই দালাল লছমনের সংবাদ পায়। কথায় কথায় তার ঠিকানা জেনে নিয়ে সে তার বাড়ির কাছে এসে অলক্ষ্যে তার ঘরের উপর দৃষ্টি রাখে।

এক দিন দু'দিন কেটে গেল। বিশেষ কিছু ঘটল না। তৃতীয় দিনে একজন লোককে তার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখা গেল। খানিক বাদে লোকটি উত্তেজিত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। তাকে বলতে শোনা গেল, আমি সব জানি, যদি আমায় উপযুক্ত টাকা না দাও তো সব কথা পুলিসে ফাঁস করে দেব।

কথাটা দালালবেশী ইন্‌স্‌পেক্টরের কানে যায়। তিনি -গোপনে লোকটির অনুসরণ করেন। তার পেছনে পেছনে এসে বন্দরে উপস্থিত হন। সে যখন তার ঘরে ঢুকছিল ইন্‌স্‌পেক্টর কাছে এসে বললেন, একবার শোন।

চমকে উঠে লোকটা পেছন ফিরে তাকাল। ইন্‌স্‌পেক্টর তাকে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমায় এখুনি আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সে বললে, সে কি করে হবে। আমি এখানকার রক্ষী। আর কিছুক্ষণ বাদেই আমার ডিউটি পড়বে।

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, যদি তুমি এখনি না আস তোমায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাব। আর যদি ভালয়-ভালয় আস তাহলে তোমায় গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি সদুত্তর দাও ছেড়ে দেব।

কোন উপায় না দেখে লোকটি ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে যেতে শুরু করে। লোকটির নাম রসুল '

এই ঘটনার পর তিন দিন বাদে গুজরাট অয়েল কোম্পানির তিনজন অংশীদার —সেঠ সিং, জেটমল ও শুকনরামকে থানায় উপস্থিত থাকতে দেখা গেল। ইন্স্পেক্টর তাদের বিরুদ্ধে ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ক্ষতি করার অভিযোগে পুলিস কেস করেছেন। যাতে মামলাটা মিটে যায় সেই উদ্দেশ্যে তারা তিনজনেই আজ থানায় এসেছে।

ইন্স্পেক্টর যখন তাদের সঙ্গে কথা বলছেন, হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে তুলে নিয়ে ইন্স্পেক্টর শুনতে পেলেন যে লছমন মারাত্মকভাবে আগুনে পুড়ে গেছে। বাঁচবার আশা নেই। সে মারা যাবার আগে কি যেন বলতে চায়। আপনাকে খুঁজছে।

খবরটা শুনেই ইন্স্পেক্টর চমকে উঠলেন। তিনি তক্ষুণি গুজরাট অয়েল কোম্পানির অংশীদারদের বিদায় দিয়ে লছমনের বাড়ির দিকে দৌড়লেন।

বাড়ি পৌঁছে তার কাছে হাজির হয়ে ইন্স্পেক্টর চমকে উঠলেন। সে তখন ধুঁকছে। চোখদুটো পুড়ে একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে।

ইন্স্পেক্টর আসতে সে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বহুকষ্টে বললে, আজ দুপুরে সেঠ সিং, জেটমল ও শুকনরাম এসে তাকে শাসায়। বলে সে যদি মিথ্যে সাক্ষী না দেয় তাকে খুন করবে।

সে রাজী না হওয়ায় তার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন দিয়ে তারা পালিয়ে গেছে।

এই বলে লছমন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে।

ইন্স্পেক্টর যদিও তার মৃত্যুকালীন জবানবন্দি লিখে নিলেন তবুও তার কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ সেদিন ঠিক সেই সময়ে তারা তিনজন তাঁর অফিসে বসে ছিল। কিন্তু ঘটনাটার মধ্যে যে খুব রহস্য আছে সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহ হয়নি। তাছাড়া লছমনের মৃত্যুতে ইন্স্পেক্টরও খুব হতাশ হয়ে পড়ল। কারণ প্রথম যেদিন তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে থানায় এসে জবানবন্দি নেন, লছমন বলেছিল গুজরাট অয়েল কোম্পানির অংশীদার সেঠ সিং প্রায়ই বন্দরে এসে খোঁজ নিত কোন তেলের জাহাজ এসেছে কি না। যদি এসে থাকে তাহলে কবে ও কখন পাইপ লাইনের মধ্যে দিয়ে তেল পাঠাবে।

তা ছাড়া সে আরো বলেছিল, যেদিন ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির তেল ড্রাম থেকে বেরিয়ে নষ্ট হয়ে যায় সেদিনই সকালে বন্দর থেকে তেল পাঠিয়ে সেটা ভরতি করা হয়েছিল। এই সংবাদ সেঠ সিং অনুসন্ধান করতে আসার অজুহাতে তার কাছে জেনে গেছে।

সে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বললে···[পৃষ্ঠা ৪০

এই খবরের উপর নির্ভর করে গুজরাট অয়েল কোম্পানির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করা যায় না বটে কিন্তু ষড়্‌যন্ত্রের সঙ্গে যে তারা ভালভাবে লিপ্ত আছে তা বোঝা যায়। তাই এই অংশীদারদের সঙ্গে যারা লিপ্ত আছে তাদের ভয় দেখাবার জন্যে ইনস্‌পেক্টর অংশীদারদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের প্রথমেই গ্রেপ্তার করেন। জামিনে খালাস হয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে তারা সেদিন থানায় হাজির হয়েছিল। আর তাদের বিরুদ্ধে পাছে সাক্ষি দেয় এই ভয়ে নিজেদের পরিচয়ে ছদ্মবেশী গুণ্ডা পাঠিয়ে লছমনকে সরিয়ে দিলে চিরদিনের মত।

যাক সে কথা।

মামলার শুনানি শুরু হল। কাঠগড়ায় আসামী অংশীদারেরা উপস্থিত। তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে যে উঠল তাকে দেখে তারা আঁৎকে উঠল। সে হল রসুল। কাঠগড়ায় উঠে রসুল বললে, এই অংশীদাররা তাকে প্রলোভন দেখায়, তার ফলে সে প্রথম প্রথম কেলিওয়াদা প্রদেশের পাইপের সংযোগের মুখ ঢিলে করে দিত। এই কাজের জন্যে আসামীরা তাকে প্রতিবার হাজার টাকা করে পারিশ্রমিক দিয়েছে।

সে আরো বলে, আসামীদের প্ররোচনায় ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির ড্রামের মুখ কেটে তেল বার করে দিয়েছিল।

কিন্তু মাত্র একজন লোকের সাক্ষির উপর নির্ভর করে তো কাউকে সাজা দেওয়া যায় না। তাই ইন্‌স্‌পেক্টর বার্মা অয়েল কোম্পানির ম্যানেজারকেও সমন দিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

ম্যানেজার তাঁর সাক্ষিতে বলেন, প্রথমে যখন পাতকুয়া জমা দেওয়া শুরু হয় তখন নিলামে দাম উঠত আটশ নশ টাকা। কিন্তু সে সময়ে পাইপ ফাঁক হয়ে তেল বেরোত না। যেটুকু নষ্ট হত তা কাজ করতে গেলেই হয়। কিন্তু এই আসামীরা জমা নেবার পর ঘন ঘন তেল নষ্ট হচ্ছে।

সাক্ষীদের জবানবন্দি শুনে বিচারক সব দিক বিচার করে আসামীদের যথাযোগ্য শাস্তি দিলেন।

বিচার শেষ হয়ে যাবার পর ওয়েস্টার্ন অয়েল কোম্পানির অফিসে একদিন ইন্‌স্‌পেক্টরকে বসে থাকতে দেখা গেল। একজন ডিরেকটর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করে অপরাধীদের আবিষ্কার করলেন ?

ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন, শুধু চিন্তা করে।

—কি রকম ?

—কোন কাজই মানুষ বিনা কারণে করে না। কারণ দু'রকম হয়। একটা হিংসামূলক আর একটা লাভজনক। প্রথম কারণটা বিশ্লেষণ করে বাদ দিই। কারণ আপনাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে আপনাদের প্রতিযোগী কোম্পানি। কিন্তু তারা এত বড় যে এদিকে তাদের নজর পড়বে না।

তখন অনুসন্ধান শুরু করি এ কাজে কাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা। যখন জানলাম স্বাভাবিকভাবে নষ্ট হওয়া তেল যে পরিমাণে পাতকুয়ায় জমা হয় তার যা মূল্য, এখনকার জমা নেওয়া মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী, তখন এই ঠিকাদারদের উপর সন্দেহ পড়ে।

শুধু সন্দেহে কাউকে তো অপরাধী করা যায় না। তাই সাক্ষীর জন্যে কেলিওয়াদা প্রদেশে অনুসন্ধান চালাই। ভাগ্যক্রমে লছমনের নাম জানতে পারি। তার উপর নজর রাখতে গিয়ে রসুলের দেখা পাই। তার কাছে সব শুনে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল। বাকী খবর আপনারা জানেন।

এই বলে ইন্‌স্‌পেক্টর উঠে পড়লেন চেয়ার ঠেলে।

———

অবাক গল্প

শ্রীসমীরকুমার শেঠ

আজ তোমাদের একটা মজার গল্প বলি শোন,
চুপটি ক'রে বস সবাই গোল কোর না কোন।
গ্রামের পথে সেদিন আমি যাচ্ছি সকাল বেলা,
বনের মাথায় হালকা রোদের লুকোচুরি খেলা।
হঠাৎ কিসের শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখি
পাগলা সে এক বুনো মহিষ আসছে তেড়ে, একি!
ভয়ে আমার বুক শুকালো, কেউই তো নেই কাছে,
এমন সময় পড়লো মনে—একটা উপায় আছে।
পাশেই ছিল সরষের ক্ষেত—গেলাম সেথা ছুটে,
চুপটি করে রইনু বসে একটাতে তার উঠে।
মোষটা ছিল বড্ড গোঁয়ার, গাছের নীচে এসে
মাথা দিয়ে গোড়াতে তার ধাক্কা মারে শেষে।
পাকা পাকা সরষেগুলো চাপ লেগে তার পায়
ক্রমে তেলের মস্ত সে এক নদীই হয়ে যায়।
তারি স্রোতে ভেসে গেল হতচ্ছাড়া, পাজি!
নির্ঘাত সেই মৃত্যু থেকে আমিও ভাই বাঁচি।
একটা তখন সরষেখোলার নৌকা করে নিয়ে
তেলের নদী পেরিয়ে তবে পৌঁছি বাড়ি গিয়ে।
এই মরেছে! তোমরা অমন হাঁ করে রও কেন?
গল্প এটা!—সত্যি কথা ভেবোনাকো যেন।

———

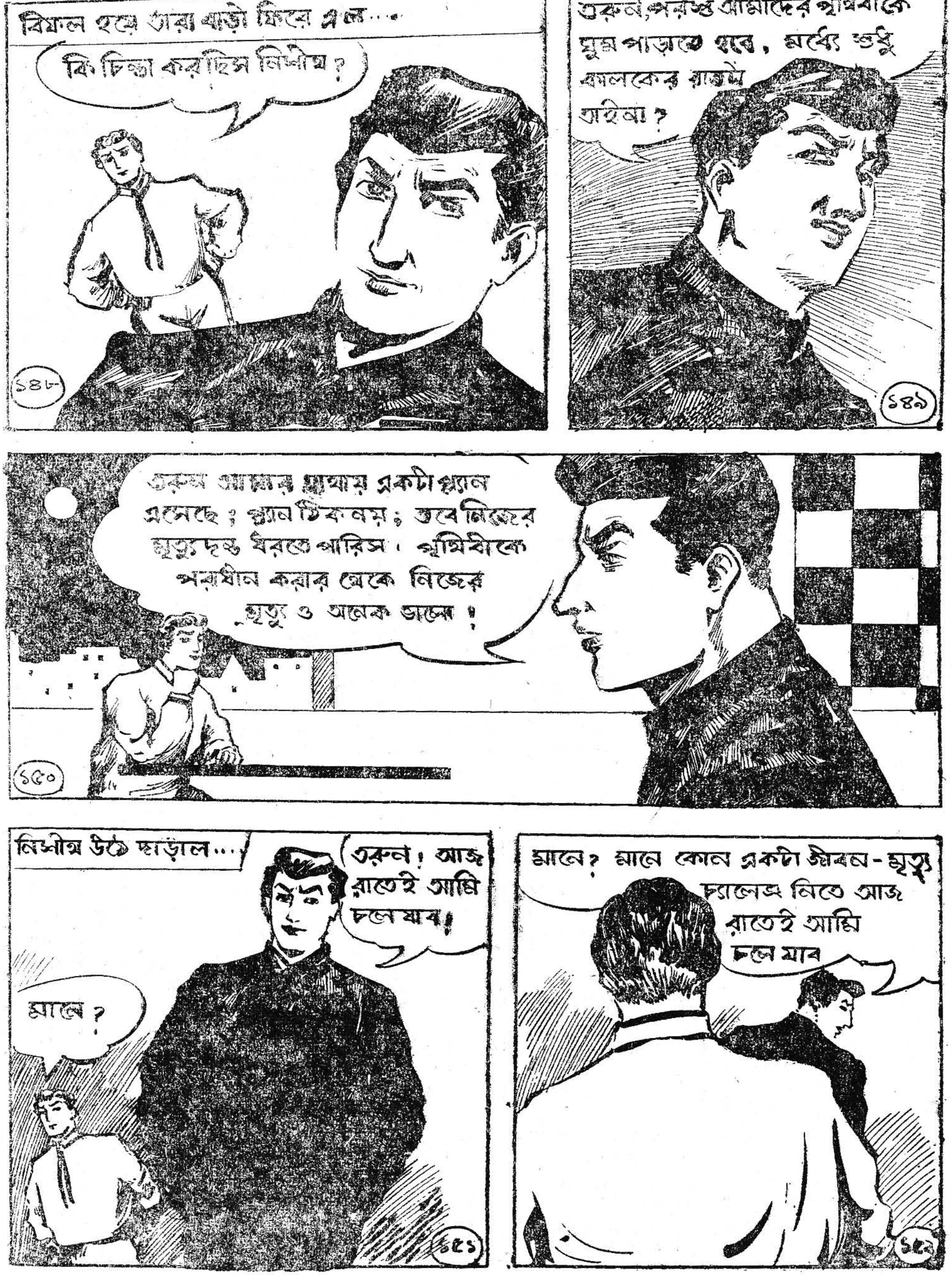
বিফল হয়ে তারা বাড়ী ফিরে এল...
কি চিন্তা করছিস নিশীথ ?
১৪৮
তরুন, পরশু আমাদের পৃথিবীকে ঘুম পাড়াতে হবে, মধ্যে শুধু কমলকের রাজত্বে চাইনা ?
১৪৯
তরুন আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে ; প্ল্যান ঠিক নয় ; তবে নিজের মৃত্যুদন্ড ধরতে পারিস । পৃথিবীকে পরাধীন করার থেকে নিজের মৃত্যু ও অনেক ভাল !
১৫০
নিশীথ উঠে দাঁড়াল...
তরুন ! আজ রাতেই আমি চলে যাব।
মানে ?
১৫১
মানে ? মানে কোন একটা জীবন-মৃত্যু চ্যালেঞ্জ নিতে আজ রাতেই আমি চলে যাব
১৫২

আমি সঙ্গে যাবনা?!
না শুধু শুধু তোকে ও মেরে ফেলে কোন লাভ নেই!
তুই ছাড়া আমার বেঁচে থেকেও লাভ নেই নিশীথ।
পৃথিবীর জন্য এই দুঃখটা তুই সহ্য কর তরুণ; আমাকে একাই যেতে হবে
নিশীথ অন্ধকারে বেরিয়ে গেল
এইকি নিশীথের সঙ্গে শেষ দেখা
পরদিন রাত্রি বেলা! কাল সকালেই ওদের যেতে হবে পৃথিবীতে! কিন্তু নিশীথ কোথায়?
আপনার বন্ধুকি ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল…
নিশীথ জীবনে কখনও ভয় পায়নি মাননীয় মন্ত্রী
নিশীথ এখনও ফিরলনা কেন? তবেকি নিশীথ বেঁচে নেই?

(ক্রমশঃ)

নব পর্যায় (১)

সব্যসাচী

এ-বনটা লাগছে বেশ।

মহামহীরুহদের চারতলার ডালে ডালে টারজানের গতিবিধি। সেখানে আথালপাথাল দমকা হাওয়ার দাপট আর ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখ-ঝলসানো আলোর ঝলক।

নীচে মাত্র একবারই নামে টারজান। সেই দুপুরবেলায়। ঐ সময়টাতেই সামান্য একটু আবছা আলো সেখানে ফোটে—হরিণটা শূকরছানাটা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। অন্য সময়ে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, ঝোপঝাড় রাক্ষুসে লতায় জট-পাকানো একটা জমাট কালো বিভীষিকার রাজ্য।

দুপুরবেলায় একবারটিই এই নীচুতলার মাটিতে টারজান নামে শিকারের চেষ্টায়। তীর ধনুক আছে, ঘাসের দড়ির ল্যাসো আছে, যে-কোন রকমে একটা-কিছু জানোয়ার পাকড়াও করে তাকে নিয়ে তক্ষুণি আবার উঠে যায় তার চারতলার স্বর্গরাজ্যে; সেখানে ছোরা দিয়ে ফালি ফালি করে কেটে কেটে তাজা গরম রক্তমাখা কাঁচা মাংস—

রাজার সঙ্গে আমি মস্করা করতে পারি ? [পৃষ্ঠা ৪৮

আঃ, উপাদেয় !

ভোজ শেষ করে নীচের দিকে তাকায় একবার। দোতলার ডালে একটা-না-একটা চিতা এসে বসে আছে প্রসাদের আশায়। কাউকে নিরাশ করা রাজধর্ম নয়। আর টারজান ত বনরাজ্যের একচ্ছত্র রাজা !

আজকের চিতাটা প্রসাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেল না, আলাপ জুড়ে দিল রাজার সঙ্গে। ঘর্‌-ঘর্‌—ঘরর্‌! ঘুরুং-ঘুর্‌—ঘরঘটাং

টারজান কান পেতে শুনল। চিতার ভাষা সে বোঝে এবং সে-ভাষায় কথা কইতেও পারে। জন্তুটার প্রথম আওয়াজেই সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন এবং জবাবের পর জবাবে যে-গল্পটা দানা বেঁধে উঠল সেটা এই রকম—

ঘুর্নিঘুটাং-এর এই জঙ্গল,—যার এক মাথায় হল সূয্যিমামার উদয়পাহাড়, আর এক মাথায় হল অস্তপাহাড়,—এর ভিতর টারজানই একমাত্র মাঙ্গানি নয় (জন্তুর জগতে মানুষেরই নাম মাঙ্গানি)।

যখন বোঙ্গানিরা (গরিলারা) এদেশে আসে নি (ফিরে যাক ঐ দুশমনেরা ওদের আগের জায়গায়, সেই চাঁদামামার মুল্লুকে), তখন কালো-কুচকুচে মাঙ্গানি গিজগিজ করত ঘুর্নিঘুটাং-এ। এখন অবিশ্যি কমই আছে, তবু একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। বোঙ্গানিরা বেশীর ভাগকেই মেরে ফেলেছে, তা ঠিক, কিন্তু পুষেও রেখেছে দু’-পাঁচটাকে।

"পুষে রেখেছে ?"—টারজান হাঁক দিয়ে ওঠে অবিশ্বাসের সুরে—"গবর-গুরাং ? ঠিক বলছিস ?"

"গুরাং-গবরা ! বিলকুল ঠিক ! রাজার সঙ্গে আমি মস্করা করতে পারি ? এই গাছ থেকে নেমে তিন দিনের রাস্তা চলে যান (আমার তিন দিনের রাস্তা মালিক, আপনার অন্ততঃ তেরো দিনের), সোজা অস্তপাহাড়ের দিকে। বোঙ্গানিদের পাড়া সেটা। ফী ঝোপে একটা করে মাঙ্গানি নফর রয়েছে বোঙ্গানিগিন্নীর হুকুমবরদারি করবার জন্য, এ যদি না নিজের চোখে দেখতে পান— গুররঘুং !"

নীচের জঙ্গলে কী-একটা শিকার দেখে গুররঘুং রবে একটা রক্ত-হিম-করে-দেওয়া গর্জন ছাড়ল চিতাটা, আর একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচেকার ঘুরঘুট্টি আঁধারে।

টারজান নিজের আরামের তেডালাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে মনে মনে বলল—ধাপ্পাবাজ ! চিতাগুলো এমন মিথ্যুক হয় ! বোঙ্গানিগিন্নীর হুকুমবরদারি করবার জন্য মাঙ্গানি ? নেশা করেছে জন্তুটা !

চারতলার সেই উধোম হাওয়ার আথালপাথাল দাপাদাপি,—বোঙ্গানি আর মাঙ্গানির চিন্তা কোথায় তলিয়ে গেল, টারজান ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্ত আরামে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন চারতলার হাওয়ামঞ্জিলেও আর আলো নেই এক কণা। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। মেজাজটা তেতো হয়ে গেল টারজানের। বসে থাক এখন চুপচাপ—যতক্ষণ চাঁদ না উঠছে আকাশে।

অন্ধকারে ত আর চারতলার ডালে ডালে পথ চলা যায় না ! অবশেষে চাঁদ উঠল, নির্মল নীল আকাশে সোনার থালার মত মস্ত বড় উজ্জ্বল চাঁদ। পাতার চাঁদোয়া ভেদ করে আলোর ঝলকানি এসে এখানে ওখানে লাগছে, একটা ধূসর আভা ছড়িয়ে পড়েছে বনস্পতিদের মাথায় মাথায়।

আর বিশ্রাম নয়। টারজান পথে নামল। হাতে কাজ কিছু নেই, চিতাটার খবরের ভিতর বস্তু কিছু আছে কি না দেখেই আসা যাক না।

নামল—মানে, মাটিতে নয়। যদিও নেশাখোর চিতাটার পরামর্শ ছিল তাই। জন্তু সে, জন্তুর মতই পরামর্শ দিয়েছে। মাটিতে পা না দিয়েও যে পথ চলা যায়, মাটির জানোয়ার সে-কথা জানবে কেমন করে ?

হতভাগা দেমাক করে বলেছিল—"আমার তিন দিনের পথ মানে আপনার তেরো দিনের।" হাঁ, বনবাদাড় ভেঙে, পায়ে পায়ে বিষধর হিস্‌টার (সাপের) ছোবল থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে পথ যদি চলতে হত, বনের রাজা টারজানকেও চিতার গতিবেগের কাছে হার মানতে হত বইকি! কিন্তু—এই বায়ুপথে? এখানে গতি অপ্রতিহত টারজানের। থামতে হয় না, ভাবতে হয় না, এ-ডাল থেকে ও-ডালে পড়ছে পাখির মত পরম নিশ্চয়তায়। পা ফেলবার জায়গাটি যদি হয় নাগালের বাইরে, উপরের কোন একখানি ডাল আঁকড়ে ধরে দুলছে টারজান—দোদুল-দোল! দোদুল-দোল! দুলতে দুলতে দিলে এক লাফ সেই চারতলার মগডাল থেকে। পড়ল গিয়ে বিশ ফুট তফাতে শাখান্তরে।

টারজানের পথ চলা আগে কোনদিন দেখা থাকলে বোকা চিতাটা অমন করে দেমাক করত না।

চলছে টারজান পশ্চিম দিকে। অস্তপাহাড়ের অভিমুখে। চিতার তিন দিন। অর্থাৎ টারজানের দেড়। বোঙ্গানিপাড়ার আজগুবী রহস্যটা মূলে আসলে কী বস্তু, দেখতে হবে তাকে। আফ্রিকায় বনরাজ্যে এমন কোন ব্যাপার থাকা উচিত নয়, বনের রাজা টারজানের যা অজানা।

পরের দিনটা অষ্টপ্রহর চলেছে টারজান, দুপুরের খাওয়ার জন্য সামান্য দুই এক দণ্ড বাদ দিয়ে। তার পরের দিন দুপুরবেলা—

ঢাক পিটোনোর আওয়াজ শুনে কান খাড়া করল টারজান।

চারতলার ব্যোমপথে ধাবমান টারজান পায়ের তলার আঁধার অরণ্যের সেই আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এরকম আওয়াজ ত গরিলারাই করে। লোহার মত শক্ত বুকে লোহার ডাণ্ডার মত শক্ত হাত দিয়ে পিটোয় যখন, অমনিধারা বিকট শব্দ হয় ঢাকের বাজনার মতই। এই তা হলে চিতা-বর্ণিত বোঙ্গানিপাড়া।

চলা বন্ধ করে টারজান বসল। তাকাল নীচের দিকে। কালোয় কালো একটা অমাবস্যার রাজ্য। গাছপালাই আছে ওখানে, তাতে ভুল নেই। কিন্তু আলাদা করে একটা গাছও চোখে দেখা যাচ্ছে না। এমন কি এই বিরাট মহীরুহগুলি—যাদের

কাঁধে কাঁধে চলে বেড়াচ্ছে টারজান—তাদেরও গোড়ার অংশটা সেই একটানা আঁধারের ভিতর বেমালুম মিশে গিয়েছে।

নামতে হল টারজানকে। তেতলায়, সেখান থেকে দোতলায়। কিছু নাঃ! কিছু চোখে পড়ে না তবুও।

মাটিতেই নামতে হবে তাহলে। খাওয়ার সময়ও হল। একসাথে দুই কাজ সেরে আসা যাবে। গরিলাদর্শন এবং খাদ্যান্বেষণ।

কিন্তু বোঙ্গানিপাড়ার জঙ্গল তেমন জঙ্গল নয় যে নামব মনে করলেই নামা যাবে। যে-গাছ বেয়ে নামছে টারজান তার দোতলার নীচে আর পৌঁছানোর উপায় নেই। মাটি থেকে কাঁটা-লতা এভাবে গুঁড়ি বেয়ে উঠেছে, নামতে গেলেই সেই কাঁটায় গেঁথে যেতে হবে।

নিরুপায় টারজান আবার উপরে উঠে গেল। চারতলায় পৌঁছে পরের গাছটায় চড়ে বসল। আবার সে-গাছের গুঁড়ি বেয়ে নামা। এবারও আগের অবস্থা। গাছের পর গাছ, এইভাবে একবার নামা একবার ওঠা। শেষে বিরক্ত হয়ে টারজান মাটিতে নামার চেষ্টা ত্যাগ করল।

আবার চলেছে চারতলার পথে। তবে নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে। যদিও দৃষ্টিতে একটানা আঁধারের যবনিকা ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। আর চারিদিকে ক্রমাগত শোনা যায় ঢাকের বাজনা—ডুং ডুং ডুডাং ডুং।

যাঃ—এটা কী?—এতক্ষণে একটা বৈচিত্র্য।

নদী! নদী একটা!

তড়াক করে নেমে এল টারজান দোতলার ডালে। ঠিক তার নীচেই নদী। চওড়া তেমন বেশী নয়, কিন্তু স্রোতটা প্রবল।

আফ্রিকার অরণ্যে অজানা স্রোতস্বিনী। কুমির থাকতে পারে, জলকেউটে সাপ থাকতে পারে, থাকতে পারে জলহস্তী। কিন্তু বিপদের কথা চিন্তা করে কবে কাজ করেছে টারজান? দোতলার ডাল থেকে ঝুপ করে সে লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে।

মাঝনদীতে একফালি রোদ্দুর এসে পড়েছে এক জায়গায়। তার দুই

ধারে তীর পর্যন্ত নিবিড় কালো ছায়া; ডালে ডালে পাতায় পাতায় যেন শামিয়ানা টাঙানো।

স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে টারজান। লক্ষ্য রেখেছে কূলের দিকে। বন্য-পশুরা জল খেতে আসে না? তাদের চলাচলের সুঁড়িপথ আছেই কোথাও। সে-পথে অন্য মাঙ্গানি চলতে না পারুক টারজান পারবেই।

ঢাকের বাজনা এখনও শোনা যাচ্ছে, তবে তত স্পষ্ট নয় আর। অর্থাৎ বোঙ্গানিপাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে এসেছে টারজান। পিছন ফেরা দরকার।

হাঁ, ঐ যে একটা পথরেখা চোখে পড়ল এতক্ষণে।

নীচেটা পরিষ্কার, কিন্তু মাটির দু' হাত উপরেই লতাপাতা ছিটকি ডাল। অর্থাৎ দু' হাত উঁচু জানোয়ারেরাও এ-পথে জল খেতে আসে। চিতা? বন্যবরাহ? চিতল হরিণ? সিংহ? না। আফ্রিকার এ-অঞ্চলের সিংহ দু' হাতের বেশী উঁচু। গণ্ডার বা হাতীর ত প্রশ্নই ওঠে না।

এই পথই ধরতে হবে টারজানকে। হামা দিয়েই চলতে হবে অবশ্য। কিন্তু তার আর উপায় কী?

কষ্ট? কষ্টকে কষ্ট বলে বিবেচনা করলে টারজান আজ টারজান হত না। কাঁটাঝোপের তলা দিয়ে আধহাত চওড়া আঁকাবাঁকা পথে আশ্চর্য কসরতে সে চলেছে ফণাধর হিস্‌টাদের ফোঁসফোঁসানিতে ভ্রূক্ষেপ না করে। বেকায়দা হয়েছে ধনুকটা নিয়ে। সোজা হয়ে কোনমতেই থাকে না সেটা। কাঁধের উপরকার বাঁকানো ডগাটা বরাবরই ডাইনে-বাঁয়ে ঝোপের ভিতর ঢুকে ঢুকে আটকে যাচ্ছে।

অনেক—অনেকক্ষণ এই সুড়ঙ্গপথে কাটল টারজানের। নদীর কিনারে পথের মুখে যে-আলোটুকু ছিল, তা কখন নিবে গিয়েছে। এখন পথ চলতে হচ্ছে অন্ধকারে —ভাগ্যিস প্রয়োজন হলে অন্ধকারেও দেখতে পায় টারজান। দেখতে যেটা পায় না, সেটারও উপস্থিতি কী জানি কেমন করে সে টের পায়। চোখ কান ইত্যাদি করে পাঁচটা ইন্দ্রিয় থাকে সব মানুষের। টারজানের কিন্তু ওসব ছাড়াও ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় আছে, চোখে তা দেখা যায় না, কিন্তু আছে সে ঠিকই, তা নইলে আসন্ন বিপদের আভাস ঠিক সময়টিতে টারজান পায় কী করে, চোখ কান নাসিকার দিক থেকে কোন সাহায্য না পেয়েও?

আজ এই মুহূর্তে তেমনি একটা আভাস পাচ্ছে কি টারজান? একটা মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে তার সমুখেই? সদা-সতর্ক বনের রাজা চতুর্গুণ সতর্ক হয়ে উঠল চকিতে। নিশ্চল, নিস্তব্ধ, পাথর বনে গেল যেন। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে।

সড় সড় সড় সড়—একটা অতি মৃদু শিহরন জাগছে কি মাটির বুকে? অতিকায় কোন হিস্‌টা কি আক্রমণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে?

সড় সড় সড় সড়! সাপই বটে, কেউটে বা করেত বা গেছো সাপের মত ছোটখাট সরীসৃপ নয়। পাইথন? চন্দ্রবোড়া? ময়াল? একটা ভারী জিনিস নিঃশব্দে চলেছে ঠিক টারজানের আগে আগে।

নিঃশব্দে চলেছে—সব হিংস্র জন্তুরই আক্রমণের ধারা এক রকম। বাঘ বল, কুমির বল, সাপ বল—ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একেবারে নিশ্চুপ।

কার উপর? কার উপর? হরিণ যদি হয়, টারজানের নিজেরও একটা হরিণ দরকার উদরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্ষুধার চাইতেও বড় কোন প্রবৃত্তির তাড়নায় আবার পথ-চলা শুরু করল টারজান, যথাসম্ভব দ্রুত, যথাসম্ভব নিঃশব্দে।

বেশীদূর যেতে হল না। একটা সাঁই সাঁই শব্দ, বাতাস কেটে চাবুক ঘুরছে যেন। তারপরই তীক্ষ্ণ একটা চীৎকার! পরিত্রাহি চীৎকার!

টারজানের বুকটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। এ কি মানুষের চীৎকার নয়? ভাষাটা বোঝা যায় নি, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা ত ভুল হওয়ার নয়!

ছুটে যাওয়ার উপায় নেই সে-সুড়ঙ্গপথে। তবু হামা দেওয়ার ভিতরই, যতটা পারা যায় গতিবেগ বাড়িয়ে, টারজান ছুটল। আঁধার ফিকে হয়ে আসছে, আলো ফুটছে একটু একটু। সুড়ঙ্গমুখ চওড়া হচ্ছে। সামনে একটু ফাঁকা জায়গা। সেই জায়গাটুকুতে—হাঁ—মর্মান্তিক বিয়োগান্ত ঘটনাই একটা ঘটছে বটে।

ময়াল! একটা গাছের গুঁড়ির মত বিশাল ময়াল। এক পেঁচ দিয়েছে একটা প্রাণীর দেহে। প্রাণীটা বানর হতে পারে, মানুষের বাচ্চা হতে পারে। হাঁ, মানুষই বটে, বানরের অমন লম্বা কোঁকড়া চুল হয় না।

টারজান ছুটে গিয়ে ময়ালের ঘাড় টিপে ধরল। যে-বজ্রপেষণে সিংহের ঘাড়ও মট্ করে ভেঙে যায়, ময়াল তাকে নিঃশব্দে সহ্য করতে পারল না। শিকারের অঙ্গ

থেকে শিথিল হয়ে গেল তার দেহের বাঁধন, প্রাণীটা পিছলে বেরিয়ে গেল মৃত্যুর গ্রাস থেকে। তখনও তার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যায় নি, সে গড়াতে গড়াতে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ক্রমশঃ।

ময়ালকে মেরে ফেলার মতলব টারজানের নয়, কারণ জীবমাত্রকেই সে ভালবাসে। আত্মরক্ষার বা আশ্রিতরক্ষার তাগিদে ছাড়া সে কারও অনিষ্ট করে না। এক্ষেত্রে আশ্রিত প্রাণীটা বিপদ থেকে মুক্ত হতেই টারজান ময়ালকে ছেড়ে দিল, দুই হাতে ঘাড় ধরে তাকে উঁচু করে তুলল খানিকটা, তারপরই ছুঁড়ে ফেলে দিল ঝোপের ভিতরে। সর্পরাজ আর পিছনপানে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে আত্মগোপন করল জঙ্গলের অন্দরমহলে।

টারজান ছুটে গিয়ে ময়ালের ঘাড় টিপে ধরল। [পৃষ্ঠা ৫২

এতক্ষণে টারজান ভাল করে লক্ষ্য করবার অবসর পেল। কী ধরনের প্রাণী এটি, যাকে সে ময়ালের গ্রাস থেকে রক্ষা করেছে? প্রথমে তাকে মানুষ বলেই মনে হয়েছিল, এখন কিন্তু খটকা লাগছে একটু। মানুষের মত কোঁকড়া চুল থাকলে কী হবে, মুখটা ওর গরিলার মত,—ছোট্ট কপাল, চ্যাপটা নাক, মোটা সরু কালো ঠোঁটের নীচে বড় বড় দাঁত। আর হাত? হাত দুটি তার প্রায় হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। তেমনি পা দুখানা বেমানান রকমের খাটো।

এসব দেখে গরিলা বলেই তাকে মনে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভয়ানক সমস্যায়

পড়ে গেল টারজান আর একটা ব্যাপার দেখে। এ-প্রাণীটা কাপড় পরেছে। গরিলায় কাপড় পরে, এমনটা টারজান সারা আফ্রিকায় কোন জঙ্গলে দেখে নি কোনদিন।

অবশ্য কাপড় বলতে এখানে সুতোর বা পশমের কাপড় বলা হচ্ছে না, গাছের পাতা জুড়ে জুড়ে কাপড়ের মত একটা আচ্ছাদন তৈরি করা হয়েছে, শক্ত লতা দিয়ে তাই বেঁধে রাখা হয়েছে কোমর বেষ্টন করে। লজ্জানিবারণের একটা অনিপুণ প্রয়াস!

হোক অনিপুণ! টারজান নিজেই বা কোন্ নিপুণ দরজীর তৈরী রাজপোশাক পরে বনরাজ্যে রাজত্ব করছে? একটা সিংহচর্ম কোমরে জড়ানো তার। সিংহের গা থেকে চামড়া খুলে নেবার সামর্থ্য যার নেই, সে পাতা গেঁথে গেঁথে আবরণ তৈরি করা ছাড়া আর কী করতে পারে?

বসনের পারিপাট্য এখানে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল এই যে বসন পরিধানের প্রবৃত্তি কি একমাত্র মানুষেরই নিজস্ব নয়?

যদি এ-প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ' বলতে হয়, তা হলে অনিবার্যভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে যে এই প্রাণীটি—গরিলার বাচ্চার মত দেহ কিন্তু মানুষের বাচ্চার মত কোঁকড়া কালো চুল নিয়ে ভীতু চোখে টারজানের দিকে যে তাকাচ্ছে—সে মানুষ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

গরিলার ভাষা টারজান জানে। জানে গোটা আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত আদিবাসী কালো মানুষদেরও ভাষা। একে একে সবগুলো ভাষার সাহায্য নিয়েই সে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল এই ছেলেটির সঙ্গে। হাঁ, গরিলা হোক আর মানুষ হোক, দেহের মাপ দেখে একে পূর্ণবয়স্ক বলে ধারণা করা যায় না।

বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে টারজান, হঠাৎ একটা ভাষা বুঝি ছেলেটার বোধগম্য হল। টারজান বলেছিল—"তোমার নাম কী?"

উত্তর এল, ভাঙা গলায় জড়ানো আওয়াজে—"আমার নাম নামুচি।"

উৎসাহ পেয়ে টারজান জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল—আরও কত-কীই ত তার জিজ্ঞাসা করবার আছে—কিন্তু তার আর সময় হল না, হঠাৎ কানফাটানো আওয়াজে ঢাক বেজে উঠল অতি নিকটেই একটা নিবিড় ঝোপের ভিতরে।

আর নামুচি করলে কী—বেচারা বুঝি ভাবল ময়ালের বেষ্টনী থেকে যে তাকে উদ্ধার করতে পেরেছে গরিলার অত্যাচার থেকেও সে তাকে রক্ষা করতে পারবে,—ছুটে এসে—না, ছোটা তাকে বলা যায় না, খাটো খাটো পায়ে হেলতে হেলতে টলতে টলতে যথাসম্ভব দ্রুত এসে সে লম্বা দুই হাতে টারজানকে জড়িয়ে ধরল।

তার দিকে টারজানের দৃষ্টি নেই তখন। সে তাকিয়ে আছে সমুখের সেই ঝোপের দিকে। নিবিড় লতাগুল্ম ঠেলে ঠেলে এখান থেকে ওখান থেকে উঁকি দিচ্ছে হিংস্র গরিলার বীভৎস মুখ—এক, দুই, তিন, চার,—

আর গুনবার সময় হল না। একটা গরিলাকে টারজান সামান্যই গ্রাহ্য করে; ছোরা যখন হাতে আছে তখন দুটোর সঙ্গে একসাথে লড়বারও সাহস সে রাখে। কিন্তু চার চারটে?

না, টারজান বেপরোয়া বটে, কিন্তু বেহিসাবী নয়। এক মহাবনস্পতির গুঁড়ি দেখা যাচ্ছে ডান দিকে। নামুচিকে কাঁধের উপর ফেলে সেই গুঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটল টারজান।

গরিলারা হেলতে হেলতে টলতে টলতে যখন সেই মহাবৃক্ষের তলায় এসে পৌঁছাল, তখন নামুচিকে নিয়ে টারজান তেতলার ডালে।

বিকট চীৎকার শুরু করল গরিলারা রাগে আগুন হয়ে। আর তাই শুনে চারিদিক থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে গরিলা।

(ক্রমশঃ)

হাজারীবাগ জেলার গিরিডি হইতে শ্রীমতী রেবা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্বর্গগত কনিষ্ঠ সহোদর মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করিতেছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

বন্ধু-প্রীতি সম্পর্কে কোন মৌলিক গল্প

রচনা পাঠাইবার শেষ তারিখ ঃ ৩১শে বৈশাখ, ১৩৭২। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা ১৩৭২ সালের আষাঢ় সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হইবে।

প্রথম পুরস্কার ১৪৲ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৲ টাকা

মনের মতো মানুষ

তপতীরানী

বেলুড় মঠ তখন তৈরী হচ্ছে। অনেক সাঁওতাল মেয়ে ও পুরুষ মাটি কাটা ও জঙ্গল সাফ করার কাজ করছে। স্বামী বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে গিয়ে সেই সব কাজ দেখতেন। অনেক সময় স্বামীজী ঐসব সাঁওতালদের কাছে গিয়ে বসতেন ও তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন।

সাঁওতালদের একজনের নাম ছিল কেষ্টা। স্বামীজী তাকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কেষ্টার ভারী ভয় ছিল মঠের অধ্যক্ষের ওপর। তাই সে মাঝে মাঝে বলত, ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিসনি। তোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবেক আর বুড়ো বাবা এসে বকবেক।

ওর কথা শুনে বিবেকানন্দের চোখ দুটি ছলছল করে উঠত। তিনি জবাব দিতেন, না না বুড়ো বাবা বকবেন না। তুই তোদের ঘরের কথা—তোদের দেশের কথা বল্।

কেষ্টার তখন সাহস হত—ওদের সুখ-দুঃখের কথা মন খুলে স্বামীজীকে বলত। সে সব কথা শুনে স্বামীজী সব কিছু ভুলে যেতেন।

একদিন স্বামীজী লুচি তরকারি ও নানারকমের মিষ্টি তৈরি করিয়ে সাঁওতালদের খাওয়ালেন। কাছে বসে তিনি তাদের খাওয়াচ্ছিলেন। খেতে খেতে খুশী হয়ে তারা বললে, হ্যাঁরে বাপ, হামরা এমন জিনিসটি কখনো খাইনি।

স্বামীজী দীন দরিদ্রদের এমনি করে ভালবাসতেন। তিনি মনে করতেন—দরিদ্রের ভেতরই রয়েছেন ভগবান।

ছড়া

আবু কায়সার

১

কথায় বলে টাক-মাথাদের অনেক টাকা থাকে,
টাকার কুমীর তারাই নাকি তিল আছে
যার নাকে।
মটু জোলার চকচকে ঐ টাক,
ঘটু মাঝির তিল বসানো নাক,
টাকার কারণ ; সন্দেহ কি থাকে ?—
শুধিয়ে বাপু দেখতে পারো যাকে ইচ্ছে তাকে ॥

২

বিল্লীভায়া দিল্লী যাবেন, ব্যস্ত তিনি আজ,
লাল কেল্লায় জেল্লা বাড়ে তাইতো এত সাজ।
গিন্নী বলেন, মিঁও মিঁও,
গোঁপে আতর মেখে নিও,
শেষ হলে সব কাজ
নাগরা পায়ে আগরা গিয়ে দেখবে তুমি 'তাজ'

গ্রহ-স্পর্শ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেশে আকাল। মানুষ খেতে পায় না। সাধু-পুরুষও চুরি ধরেচে, কাজেই চোরেদের দুর্দশার সীমা নেই। বাংলা মুল্লুক ছেড়ে এক বাঙালী চোর চলল পশ্চিমে,—চুরি-ব্যবসা সেখানে যদি ফ্যালাও করতে পারে, এই ভেবে!

কাশীর কাছে এক চটি। সেই চটিতে দুই পাঞ্জাবী চোরের সঙ্গে তার দেখা হলো।

চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই—এমনি একটা কথা আছে। কাজেই পরস্পরে চেনাচেনি হয়ে গেল। বাঙালী চোরকে তারা জিজ্ঞাসা করলে,—কোথা চলেছ দাদা?

বাঙালী চোর বললে,—চলেছি তোমাদের দেশে,—টাকাকড়ির বড় সুবিধা হচ্ছে না দেশে···আকাল। ভারী দুর্দিন পড়েছে ভাই।

পাঞ্জাবী চোর বললে,—পাঞ্জাবেও দুঃখের সীমা নেই! না হলে আমরা দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি···

তিনজনে বসে সুখ-দুঃখের নানা কথা হলো। বাঙালী চোর বললে,—নিজের-নিজের কাহিনী শোনাই, এসো···

একনম্বর পাঞ্জাবী চোর বললে,—কিন্তু সে-কাহিনী খুব রকমারি আর রংদার হওয়া চাই···

দুনম্বর পাঞ্জাবী চোর বললে,—আর সে কাহিনী শুনে কেউ তা মিথ্যা বলতে পারবে না। মানে, সে কাহিনী মেনে নিতে হবে···

বাঙালী চোর বললে,—বেশ, আর শুনে সে-কাহিনীকে যে বলবে আজগুবী কি মিথ্যা, তাকে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে!

তিনজনেই বললে,—বহুৎ আচ্ছা!

তখন একনম্বর পাঞ্জাবী চোর নিজের কাহিনী শুরু করলো। সে বলতে লাগলো,—আমার বাবা ছিলেন লুধিয়ানার এক মস্ত গোয়ালা। গোয়ালে তাঁর গরু আর মোষের অন্ত ছিল না। গুনতিতে প্রায় সাত লক্ষ। এই সাত লক্ষ গরুর আর মোষের দুধ যা পাওয়া যেতো, সে দুধ জমা হতো মস্ত এক বাঁধানো তালাওয়ে··· তালাওয়ের এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। দুধ দোওয়া হলে সেই তালাওয়ের মধ্যে গরু আর মোষগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের মাতামাতির ফলে দুধ মইয়ে ঘোল তৈরী হতো; আর বড় বড় নৌকো ভাসিয়ে তা থেকে ছানা তুলতো যত জোয়ান পাঞ্জাবীর দল। তারপর সেই দুধ যোগান যেতো পাঁচটা লহর বয়ে। এই পাঁচ লহরের নাম হলো তোমার ঐ ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়াস আর সট্‌লেজ। এই পাঁচ লহর থেকেই সারা মুল্লুকের নাম হয়েছে পাঞ্জাব। শেষে একসময় কেমন দুর্বৎসর এলো—যত চাকরবাকর ভয়ানক চোর-বদমায়েশ হলো···আর তারা দুধে জল মেশাতে মেশাতে এমন করে তুললো যে এখন দেখবে সেই পাঁচ লহরে খালি জল আর জল! এপার থেকে ওপারে যাও,—দুধে হাত পড়বে না! তাই ভাই, আজ আমাদের এমন দুর্দশা! আর তাই বিদেশে চলেছি মূলধন গুছিয়ে নতুন ব্যবসা ফাঁদতে···

বাঙ্গালী চোর বেশ বুঝতে পারলো যে গল্পটি নিছক মিথ্যা। কিন্তু মুখে তা বলবার জো নেই! মিথ্যা বললে পাঁচশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। কাজেই সে বললে,—তা ভাই হবেই তো! সাত লক্ষ গরুর আর মোষের দুধ রাখতে গেলে অত বড় তালাও আর তার সঙ্গে পাঁচটা লহর না কাটলে কুলোতে পারবে কেন? আর ঐ চাকরবাকরদের শয়তানির কথা বলছো। হুঁঃ, ওতে পাঁচটা লহর কেন, পাঁচ-দুকুনে দশ লহর বানালেও দেখবে যে জল, সেই জল! এ আর কি এমন মজার কাহিনী হলো

চীন-সম্রাট ভারত আক্রমণ করতে এসে পেছিয়ে গেলেন।

দুনম্বর পাঞ্জাবী তখন বললে,—আমার কাহিনী বলি, শোনো…এই বলে সে শুরু করলো তার কাহিনী।

বললে,—আমার বাবার ছিল হাঁসের কারবার। সমস্ত হাঁস খেলে বেড়াবে বলে মস্ত নালা কাটানো হলো, তার নাম দেওয়া হলো সিন্ধু-নদ। এই নদে হাঁসগুলি ডানা মেলে ভেসে বেড়াতো। কি চমৎকার যে দেখাতো…যেন লক্ষ লক্ষ নৌকা সাদা পাল তুলে ভাসছে! হাঁস দেখে চীন-সম্রাট ভারত আক্রমণ করতে এসে পেছিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, ওগুলো বুঝি জাহাজ ভাসছে! সে হাঁস এত-বড় যে দেখলে পালতোলা জাহাজ বলে সহজেই ভুল হতো! তারপর সেই হাঁসেরা ডিম পাড়তে লাগলো। বাবার হুকুমে ডিমগুলো পাঞ্জাবের এক কিনারায় জড়ো করা হলো। ওদিককার তিব্বত-চীন দেশগুলো সে-ডিমের পাহাড়ে ঢাকা পড়লো। পড়ে তাদের এমন দশা হলো যে রৌদ্র না পেয়ে শীতে সব কালিয়ে মরে! আর এই ডিমের পাহাড়কে ভুল করে তারা ভাবলো, এমন সাদা পাহাড়…নিশ্চয় বরফের পাহাড়! তাই থেকে সেই ডিম-পাহাড়ের নাম হয়ে গেল হিমালয়। তিব্বতীরা নাকি ড-কে হ বলে। তারা ডিমালয় না বলে বলতে লাগলো হিমালয়। তাই থেকে ঐ হিমালয় পর্বত নাম হয়েছে। তারপর একদিন হলো কি, ঐ চীন-সম্রাটের কথা বললুম না? সেই চীন-সম্রাটের ফৌজ যখন হাঁস দেখে পালাচ্ছিল, তখন তারা সেই ডিম-পাহাড়ের উপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যেমন পড়া…ভাবো ভাই, লক্ষ লক্ষ ফৌজ!

তাদের চাপে সব ডিম ছরকুটে ভেঙে গেল। আমরা গরীব হয়ে গেলুম। অত ডিম ভাঙলো…লোকসান কি-রকম হলো, ভাবো একবার! তাই ভাই, এই স্বদেশী লোকটির সঙ্গে বিদেশের পথে বেরিয়েছি।

বাঙালী চোর বললে,—ভারী আপসোসের কথা! অমন পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল! তা এতেও মজা নেই…অত হাঁসে ডিম পাড়লে ডিমের পাহাড় হবেই তো…তবে সে-ডিম রক্ষা করবার উপায় জানা চাই। জানতে না, কাজেই এখন পস্তাবে তো…

পাঞ্জাবী চোর দুজন ভাবলো, এ তো আচ্ছা লোক! এমন আজগুবী গল্প শুনেও মিথ্যা বলে বুঝলো না…এ তো ভারী বেকুব…

তখন বাঙালী চোর বললে,—এখন আমার কাহিনী শোনো, ভাই…ভারী দুঃখের কাহিনী এ। বেকুপির চূড়ান্ত পরিচয় পাবে'খন…

বাঙালী চোরের পানে পাঞ্জাবী চোর দুজন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। বাঙালী চোর তার কাহিনী শুরু করলো,—

আমার বাবা ছিলেন গরীবের ছেলে। তাঁরা ছিলেন বারো ভাই। অর্থাৎ আমার খুড়ো ছিলেন এগারো জন। বাবা সকলের বড়। মস্ত সংসার। অন্ন-বস্ত্র বাবাকেই যোগাড় করতে হতো। বাবার কষ্টের সীমা ছিল না! এর উপর এক বিপদ ঘটলো,—ছোটকাকা একদিন গাছে উঠেছিলেন শালিক পাখীর ডিম চুরি করতে। গাছ থেকে পড়ে ছোটকাকার মাথা ফেটে গেল। রক্তে রক্ত একেবারে! বাবা ছুটে এসে রাশ রাশ ধুলো কুড়িয়ে ছোটকাকার মাথায় চাপড়ে দিতে লাগলেন। তাতে সে রক্ত থামলো। এখন সেই ধুলোর সঙ্গে ছিল কাপাসের বীজ,—বাবা তা দেখেননি। ছোটকাকার মাথা তো গেল সেরে, কিন্তু চুলের বদলে মাথায় কচি-কচি কাপাসের চারা গজিয়ে উঠলো। বোঝো ব্যাপার, মগজের মধ্যে শিকড় আঁটা! দৈবজ্ঞঠাকুর এলেন। কবিরাজ এলেন। তারপর পুরুতঠাকুর এসে স্বস্ত্যয়ন করে বললেন, তোদের বরাত ফিরেছে রে! এই মাথার খদ্দের বাংলাদেশে না জুটলেও ম্যাঞ্চেস্টার এসে ওর মাথা ইজারা নেবে! হলো তাই। ছোটকাকার মাথায় সেই কাপাসের চারা বড় হতে লাগলো। আর দু বছরে সেই সব গাছ বেড়ে তুলোর

কচি-কচি কাপাসের চারা গজিয়ে উঠলো। [পৃষ্ঠা ৬১

ফসল যা ফলতে শুরু হলো ভাই, ফরাসডাঙ্গা, সিমলের যত তাঁতি এসে তুলে নিতে লাগলো। বেহারে পাঞ্জাবে বোম্বাইয়ে মাদ্রাজে সে তুলো চালান যেতে লাগলো। লাঙ্কাশায়ার-ম্যাঞ্চেস্টারের বড় বড় কাপড়ের মিল থেকে সাহেবের দল ছোটকাকার আশেপাশে হাত পেতে ঘুরতে লাগলো···কিন্তু সবাই তো নগদ দাম দিতে পারে না! ধারে তুলো নিতে লাগলো। শেষে আমরা তুলোর যোগান দিয়ে উঠতে পারি না, এমন হলো! তারপর আমরা ক'ভাই বড় হতে আমার উপর ভার পড়েছে, পাঞ্জাবে যত তুলো যোগান দেওয়া হয়েছে তার দাম আদায় করতে। আমার দুই খুড়তুতো ভাই গেছে বোম্বাইয়ে আর কানানোরে বকেয়া দাম আদায় করতে। তা···তোমাদের সঙ্গে পথে দেখা হতে আমার অনেকখানি মেহনত বেঁচে গেল···

বাঙালী চোর এই অবধি বলে পাঞ্জাবী চোর দুজনের পানে তাকিয়ে রইলো। তারা অবাক হয়ে বললে,—কেন ?

বাঙালী চোর বললে,—খাতায় দেখি তোমাদের দুজনের বাবাই ছোটকাকার মাথার তুলো কিনেছিল। তা, তার দাম পাওনা আছে, তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা আর তোমার বাবার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা···সেই টাকাগুলি এখন দিয়ে দাও তো ভাই!

কথা শুনে পাঞ্জাবী চোর দুজন ভয়ে শিউরে উঠলো। এ বলে কি ? সর্বনাশ! কিন্তু এ কাহিনী মিথ্যা বললে পাঁচশো করে টাকা জরিমানা দিতে হবে!

আবার সত্য বলে মেনে নিলেও সেই পাঁচশো টাকার দায়! জরিমানা দেওয়া কিন্তু লজ্জার কথা! তার চেয়ে…

পাঞ্জাবী চোর দুজন থলি খুলে পাঁচশো-পাঁচশো গুনে বাঙালী চোরের হাতে টাকা দিলে। দিয়েই তলপি বেঁধে সরে পড়বার উদ্যোগ করছে দেখে বাঙালী চোর বললে,—কোথা যাও?

পাঞ্জাবী চোর দুজন জবাব দিলে,—দেশে ফিরে যাই। বাংলা মুল্লুকের মাথার যে কাহিনী শুনলুম, বাপরে, মাথায় কাপাসের চাষ, তার দরুন এই দেনা! সে মুল্লুকে গিয়ে পড়লে এমনি পুরোনো দেনা শুধতে শুধতেই ফতুর হয়ে যাবো!

এই কথা বলে তারা চটপট সরে পড়লো। বাঙালী চোর করকরে এক হাজার টাকা তলপিতে বেঁধে নিয়ে ভাবলো, আমিও দেশে ফিরি। কিন্তু ফেরবার আগে যখন কাশীর কাছে এসেছি, একবার মা-গঙ্গার জলে দুটো ডুব দিয়ে বাবা-বিশ্বনাথের চরণে প্রণাম জানিয়ে যাই!

বুদ্ধির খেলা

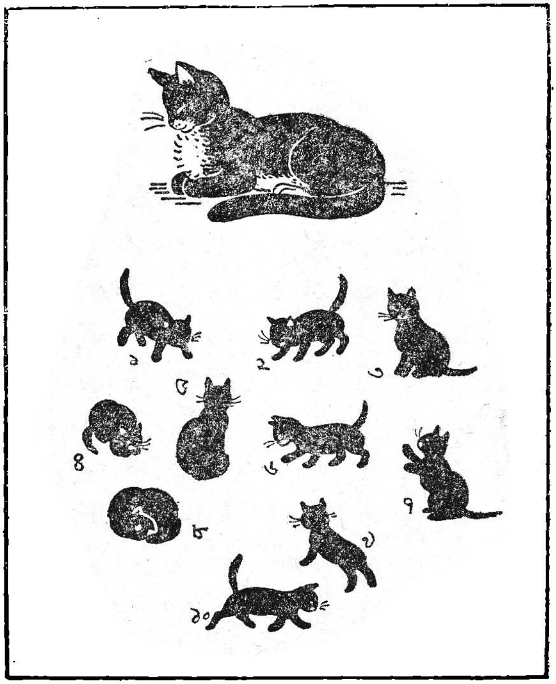

মেনীর দশটা ছানার মধ্যে একটা একটু আলাদা, বের কর দেখি।
জবাব আগামী সংখ্যায় পাবে।

হাঁদা-ভোঁদার
আক্কেল সেলামি
ওঃ! কী ভীষণ ঠাণ্ডারে বাবা। মাফলারটা জড়াই, আমার আবার একটুতেই ঠাণ্ডা লাগে।
ঐ যেরে ভোঁদা!
ঐ আসছে এবার জল্লাদটা। কাল অঙ্ক পারিনি বলে কানটা প্রায় ছিঁড়ে নিয়েছিল রে? আজ দেখাচ্ছি মজা!
হাঃ-হাঃ! একবারে সোজা আমাদের রেখে দেওয়া জলের টবের দিকে।
হই যাইয়ে। এ খেলনেকা ময়দান নেহি। বুড়ঢা আদমিকা এ কেইসা কাম।
ওফ্
আমারাও সহজে ছাড়বো না ভোঁদা! মজা দেখিয়ে তবে ছাড়বো। আয় টবটাকে এই গাড়িতে তুলে ওর পেছনে ঠেলে দি।

(এর পর ৭৫ পৃষ্ঠায় দেখ।)

বিচারে রাজা দোষী

শ্রীঅমিতাভ মিত্র

এক যে ছিল রাজা
সে খেত খুব খাজা,

—ছড়াটা বাল্যকাল থেকে বা গল্প বোঝবার জ্ঞান হওয়া থেকেই বুড়ী দিদিমা-ঠাকুরমার মুখ থেকে শুনে আসছি আমরা, তাই না ?

রাজারা যে খুব ভালবাসতেন খাজা জিনিসটা—কথাটা ঠিক ; তবে এর সঙ্গে এ কথাটাও সত্য যে রাজাদের খাজা খাওয়ার ফলে মগজটাও খাজার মতই ভুয়ো ছিল। অর্থাৎ তাঁদের মাথার বুদ্ধি বা তাঁদের বিচারপদ্ধতিও সব খাজা-খাজা ছিল। অনেক সময় বিচার করতে করতে হয়তো নিজেরাই দোষী হয়ে পড়তেন। একবার এক রাজা বিচার করতে করতে নিজেই যে কিভাবে দোষী হয়ে পড়েছিলেন সেই কথাই বলছি।

ইনি যে কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন সঠিক সেটা বলতে পারবো না। তবে এঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা বলতে পারি। ইনি ছিলেন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদার মামার মামাতো ভাইয়ের দিদিমার ভগ্নীপতির কাকার দূরসম্পর্কের এক পিসিমার জ্যাঠার দাদু। যাই হোক, তাঁকে কিন্তু আমি দেখিনি। এ কথা আমি আমার ঠাকুরমার মুখে শুনেছি।

ইনি নাকি খুব ভাল রাজা ছিলেন। রাজার সুবিচারে প্রজারা খুব খুশী হতো। আর বিচারে যে দোষী বলে সাব্যস্ত হতো তার শাস্তিও খুব সুন্দরই ছিল।

রাজার রাজ্যে সকলকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। নিয়মমত খাওয়া, সময়মত কাজ করা ইত্যাদি সময়মত সব করাই ছিল রাজার প্রধান লক্ষ্য। কেউ যদি সময়মত কোন কাজ না করত তবে রাজাকে কৈফিয়ত দিতে দিতে তার অর্ধেক প্রাণ বেরিয়ে যেত।

কয়েকদিন হলো রাজসভায় বিচারের জন্যে আর কারোর ডাক পড়ছে না।

রাজার সুবিচারে প্রজারা খুব খুশী হতো। [পৃষ্ঠা ৬৬

বন্দীশালায় কোন আসামীই নেই। আর বন্দীশালায় আসামী থাকবেই বা কেন! রাজ্যে কেউ আর অন্যায় করে না, তাই তো কারোর ডাক আসে না রাজসভায়।

কিন্তু রাজা আর চুপ করে বসে থাকতে পারেন না রাজসভায়। রাজা নিয়মমাফিক খাজা খান দুধ খান। খাজা আর দুধ খুব ভালবাসেন। এখন খাবার আসতে একটু দেরি হলেই রাজা রেগে যান। মেজাজটা আজকাল একটু খিটমিটে হয়ে আছে। তা হবারই কথা। কাজ নেই কম্ম নেই, চুপচাপ বসে থাকা—এ কি আর ভাল লাগে?

রাজার আজ বেজায় রাগ হয়েছে। আজ এখনও তাঁর প্রিয় খাদ্য দুধ, খাজা এলো না! কিছুক্ষণ বসে রইলেন; তারপর আরও অনেকক্ষণ। না, আর নয়, এবার রাজা সান্ত্রীকে আদেশ দিলেন রাঁধুনীকে তাঁর সামনে হাজির করবার জন্যে। তারপর রাজা বিচারসভায় এলেন।

বিচারসভায় রাজা বসে আছেন। সান্ত্রী রাজার হুকুমে রাঁধুনীকে নিয়ে এলো। রাজা মনের আনন্দে বিচারসভা জাঁকিয়ে বসে রাঁধুনীকে বললেন—আজ খাবার আননি কেন? তোমার জন্যে এখনও আজ আমার খাওয়া হলো না। আজ নিয়ম রক্ষা হলো না। এ অপরাধের জন্যে সাত দিন তুমি দুধ, ঘি, ছানা ইত্যাদি সুখাদ্য খেতে পারবে না। শুধু হেলেঞ্চা শাক, উচ্ছে আর রুটি খাবে।

রাঁধুনী রাজার এই আদেশ শুনে হাত জোড় করে বলল—আজ্ঞে মহারাজ, আমার এতে কোন অপরাধ নেই। আজ গরুটা দুধ দুইতে দেয়নি, তাই শুধু খাজা নিয়ে আমি ঠিক সময়েই আসছিলাম। রান্নাঘর থেকে বেরিয়েছি যেই অমনি আপনার গরুটা আমায় গুঁতিয়ে ফেলে দিয়ে আপনার খাবার খেয়ে ফেলল। তাই আমি আবার খাবার তৈরি করছিলাম।

রাঁধুনীর কথা শুনে রাজা তো চটে লাল। সভাসদেরা মুখ হাঁড়ি করে মাথা নেড়ে বলল—এ রাজ্যে গরুদের কেবল যে আক্কেল নেই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নেই। নইলে রাজার খাবার কখনও গরুতে খায়! ছিঃ ছিঃ!

রাজা বললেন—বটে! তাহলে অপরাধ হচ্ছে গরুর। তবে নিয়ে এসো গরুকে।

সান্ত্রী গিয়ে নিয়ে এলো গরুটাকে।

রাজা গরুকে বললেন—তুই কেন রাঁধুনীর কাছ থেকে কেড়ে আমার খাবার খেয়েছিস?

গরু তখন রাজাকে বলল—রাখাল আমাকে আজ দু'দিন ঘাস খেতে দেয় না! আমার কি ক্ষিদে পায় না?

আশ্চর্য!—হুমকি দিয়ে উঠলেন রাজা, ধরে নিয়ে এসো রাখালকে।

কোমরে গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখালকে সভায় এনে হাজির করা হলো।

রাজা বললেন—তুই গরুকে ঘাস দিস না কেন? তোর জন্যে গরু খেতে পায় না। তাই রাঁধুনীকে গুঁতিয়ে সে আমার খাবার খেল। তোর জন্যেই আজ আমার খাওয়া হলো না! এ অপরাধের জন্যে এক সপ্তাহ তুই দুধ, ঘি, ছানা খেতে পারবি না।

রাজার আদেশ শুনেই রাখাল হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলল—

আমার কোন অপরাধ নেই মহারাজ। কাজে আমি কখনও ফাঁকি দিই না। অনেক খুঁজে কোথাও এক আঁটি ঘাস পাইনি। কোন কৃষকই মাঠে ঘাস লাগায়নি।

এ কি অনাচার আমার রাজ্যে! যাও, নিয়ে এসো কৃষক-সর্দারকে।—হুকুম দিলেন রাজা।

কৃষক-সর্দারকে ধরে আনা হলো।

কৃষক-সর্দারকে রাজা বললেন—তুই মাঠে ঘাস লাগাস না কেন? তোর জন্যেই তো রাখাল ঘাস আনতে পারল না। তাই গরুটা না খেতে পেয়ে রাঁধুনীকে গুঁতিয়ে আমার খাবার খেয়ে ফেলল। এর সাজা তুই সাত দিন দুধ, ঘি, ছানা প্রভৃতি সুখাদ্য খেতে পারবি না।

কৃষক-সর্দারের দু'চোখ বেয়ে হুহু করে জল নেমে এলো। বলল—তাতে আমার কি অপরাধ হলো মহারাজ! বৃষ্টি না হলে মাঠে তো ঘাস জন্মায় না। আজ এক মাস হলো এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। তা ঘাস হবে কি করে বলুন?

বটে! রাজা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে বললেন—হ্যাঁ ঠিক কথা। আচ্ছা, নিয়ে এসো মেঘকে।

সান্ত্রী অনেক খুঁজে খুঁজে ধরে আনল মেঘমশাইকে।

রাজা মুখ ভার করে মেঘকে বললেন—তুই কেন মাঠে জল দিস না? তোর জন্যেই তো মাঠে ঘাস হলো না। তাই গরু ঘাস না পেয়ে আমার খাবার খেয়ে ফেলল। এ অপরাধের সাজা তোকে পেতেই হবে।

মেঘ একটু ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল—আমি কি করবো? আমার কি দোষ? ব্যাঙ না ডাকলে আমি কি করে জল দেব মাঠে? ব্যাঙই এর জন্যে দায়ী রাজামশাই।

শুনে রাজা বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিস। ব্যাঙই যত নষ্টের মূল। আচ্ছা, ধরে নিয়ে এসো ব্যাঙকে।

সান্ত্রী ছুটল ব্যাঙকে ধরবার জন্যে। ব্যাঙের বাড়ি গিয়ে সান্ত্রী ডাকল—ও ব্যাঙমশাই, ব্যাঙমশাই, বাড়ি আছেন? বেরিয়ে আসুন, রাজামশাই ডাকছেন।

নাঃ ব্যাঙের কোন সাড়াশব্দ নেই।

ব্যাঙ কি বাড়ি নেই দরজায় কড়া নাড়ে সান্ত্রী। না, দরজা তো বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

হাঁপাতে হাঁপাতে সান্ত্রী এসে রাজাকে বলল—পালিয়েছে।

পালিয়েছে! কে পালিয়েছে?—ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ান রাজা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, পালিয়েছে; ব্যাঙ পালিয়েছে; ঘরে তালা দেওয়া। হাঁপাতে থাকে সান্ত্রীমশাই।

অ্যাঁ, পালিয়েছে! কোথায় পালিয়েছে? যাও সব। যেখান থেকে পার ধরে নিয়ে এসো ওকে।

ছুটল সান্ত্রী, ছুটল সেপাইদল।

তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না—সেপাইদল ফিরে এলো।

অকর্মণ্যের দল যত সব!—গর্জে ওঠেন রাজামশাই। পুচকে একটা ব্যাঙ, তাকে এরা এতগুলো লোক ধরতে পারে না! মুখ বেজার করে রাজা বসে থাকেন।

নিস্তব্ধ। রাজসভা একেবারে স্তব্ধ।

হঠাৎ সভার কোনার দিকে একটা শোরগোল উঠল।

পথ ছাড়, পথ ছাড়, যেতে দাও—বলতে বলতে ব্যাঙমশাই এগিয়ে চলেছে।

রাজা উঠে দাঁড়ালেন। দেখেন, থপাৎ থপাৎ করে লাফাতে লাফাতে ব্যাঙমশাই এগিয়ে আসছে।

রাজার মুখে হাসি ফুটল। সাথে সাথে সভাসদদেরও মুখে হাসির রেখা দেখা দিল।

মহারাজ, আপনি আমার খোঁজ করছিলেন?—হাত জোড় করে ব্যাঙ বলল।

রাজা বললেন—হ্যাঁ। তুই মেঘকে ডাকিস না কেন? তোর জন্যেই এত কাণ্ড! তুই যদি ডাকতিস তাহলে জলও হতো ঘাসও হতো আর গরুটাও আমার খাবার খেত না। তুইই বিচারে দোষী।

কটকট করে ব্যাঙ বলল—আমার কোন দোষ নেই মহারাজ। আমাদের বংশ সব শেষ করে ফেলল ঐ সাপেরা। সাপই এর জন্যে দায়ী। রোজ যদি

আমাদের ছেলে মেয়ে নাতি নাতনীদের খেয়ে ফেলে ওরা তাহলে আমাদের মনে কি আনন্দ থাকে? আপনি সাপকে ডেকে ওর ব্যবস্থা করুন।

সাপ লেজ বাঁকাতে বাঁকাতে মুখ ঘুরিয়ে রাজসভায় এলো রাজার হুকুমে।

সভাসদেরা নাকের মধ্যে নস্যি গুঁজে বলাবলি করতে লাগল—এই তো বিচার। এই রকমই তো চাই।

রাজা বললেন সাপকে—তুই কেন ব্যাঙ খাস? তোর জন্যেই আজ আমার নিয়ম রক্ষা হলো না। তুই যদি ব্যাঙ না খেতিস তাহলে বৃষ্টিও হতো ঘাসও হতো গরুও আমার খাবার খেত না। তুই এর জন্যে দায়ী।

ছুটল সান্ত্রী, ছুটল সেপাইদল। পৃষ্ঠা ৭০

সব কথাগুলো মন দিয়ে শুনল সাপ। তারপর ফণা তুলে বলল—আমি কি খাব? আমার খাদ্যই তো ব্যাঙ। এতে আমার কোন দোষ নেই। সম্পূর্ণ দোষ হচ্ছে ব্যাঙেদের। ওরা যদি না থাকতো তাহলে তো আর আমি ওদের খেতাম না।

তাই তো তাই তো, সাপ ঠিক কথাই বলেছে। রাজা ব্যাঙকে বললেন—তুই-ই ঠিক এর জন্যে দায়ী। তুই যদি না থাকতিস তাহলে এত কাণ্ড আজ হতো না। তুই-ই দোষী।

ব্যাঙ খুব রেগে গেল রাজার 'পরে, বলল—আমি যদি না থাকতাম তবে বৃষ্টি যে হতো না। আমার কোন দোষ নেই। আমার ডাক না শুনলে মেঘ কেন

জল দেয় না। এর জন্যে মেঘই দায়ী। বৃষ্টি না থাকলে তো আর আমি ডাকতাম না।

রাজা বুঝলেন, সত্যিই বৃষ্টিই হচ্ছে এর মূল। মেঘকে ডেকে তিনি বললেন—তুই-ই এর জন্যে দোষী। তুই না থাকলে তো আর কোন কথাই থাকতো না। তুই-ই এর সাজা পাবি।

মেঘ কড়কড় করে বলল—আমার কি দোষ? কোন কারণেই আমি দোষী হতে পারি না! আমি না থাকলে তো কৃষকেরই অসুবিধা। কৃষকের জন্যেই আমি পড়ে আছি। আপনি কৃষককে বলুন। কৃষকই দোষী। আমি জল না দিলে সে কেন ঘাস তৈরি করে না।

রাজা কৃষককে বললেন—দেখ তুই এর জন্যে দোষী। তুই না থাকলে এত সব কাণ্ড হতো না। তুই বাপু যত নষ্টের মূল।

কি? আমি যত নষ্টের মূল? এতে আমার কোন দোষ নেই মহারাজ। দোষ যদি হয় তবে রাখালের। সে যদি আমার কাছ থেকে ঘাস না নিত তাহলে আর এত কাণ্ড হতো না। ওর জন্যেই তো আমি··· কাঁপতে থাকে কৃষক।

খুব রেগে গেলেন রাজা রাখালের 'পরে—তাহলে তুই-ই দোষী। তোর জন্যেই সব! হুমকি দেন রাজা।

রাখাল বলল—কোন্ আইনে আপনি আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন? আমার তো একটুও দোষ আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি ঘাস না পেলে গরুকে খাওয়াবো কি? গরু যদি ঘাস না খেত তাহলে কিছুই হতো না।

হ্যাঁ, গরু যদি ঘাস না খেত তাহলে আর কোনই হাঙ্গামা হতো না। গরুই সম্পূর্ণ দোষী। রাজা বললেন।

কান খাড়া করে গরু শুনল রাজার কথা। মুখ নাড়িয়ে লেজ ঘুরিয়ে গরু বলল—বাঃ বাঃ, আমার দোষটা দেখলেন কোথায়? ঘাস না খেলে দুধ হয় না। রাঁধুনী আসে আমাকে মারতে। রাঁধুনীর জন্যেই আজ এত কাণ্ড হচ্ছে। আপনি রাঁধুনীকে ডেকে এর সাজা দিন।

রাঁধুনী একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা তাকে ডেকে বললেন—তুই যদি

গরুর কাছ থেকে দুধ না নিতিস তাহলে এত কাণ্ড হতো না। তুই নিশ্চয়ই দোষী।

রাঁধুনী হাত জোড় করে ভয়ে ভয়ে বলে—আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি যদি ঠিক সময়মত আপনাকে দুধ খাওয়াতে না পারি তাহলে আমার চাকরি থাকবে না। তাই তো গরুর কাছ থেকে আমি দুধ নিই।

বড় গোলমেলে ঠেকল রাঁধুনীর কথাটা। কি হলো ঠিক কিছু বুঝতে পারছেন না রাজা। তবে দোষীটা কে?

রাজা মনে মনে বুঝলেন দোষ তাঁরই। তিনি যদি দুধ না খেতেন তাহলে এসব হতো না। এদিকে সভা শেষ হবার সময়ও হয়ে গেছে। নিয়ম রক্ষা করতে হবে। তাই তিনি আজকে আর কোন বিচার না করে সভা ভেঙে দিলেন।

পরে কবে যে সেই বিচারটা বসেছিল তা আমি ঠিক জানি না। এবং বিচারের ফলাফলটাও আমাকে ঠাকুরমা বলে যেতে পারেননি। কারণ তার আগেই স্বর্গের রথ এসে গিয়েছিল ঠাকুরমার জন্যে।

———

ন্যায্য ভাগ

একদিন বাবুল কাটলেট ভাগ করার সময় নিজের পাতে বড় কাটলেটটা রেখে বন্ধুকে দিয়েছিল ছোটটি। তাতে বন্ধু বেজায় চটে গেল। তখন বাবুল তার বন্ধুকে শুধালে, তুই হলে কি করতিস?

আমি? বন্ধু বলল—আমি নিজের পাতে ছোটটা রেখে বড়টা তোকে দিতাম।

বাবুল তখন বড় কাটলেটটি খেতে খেতে বলল—তাই তো পেয়েছিস, তবে আর মেলা ফ্যাচফ্যাচ করছিস কেন?

—প্রশান্ত রায়চৌধুরী

ঘাড় দেখে দিক ঠিক করো

শ্রীবৈজ্ঞানিক

তোমরা দল বেঁধে বনে বেরিয়েছিলে শিকার করতে। শিকারের নেশায় ছুটোছুটি করে তোমরা পথ হারিয়ে ফেললে, কোন্‌টা কোন্‌ দিক্‌ তা খেয়াল রাখতে পারলে না।

দিক্‌ই যদি ঠাহর করা না যায়, তাহলে বন থেকে বেরোবেই বা কেমন করে? সাথে দিক্‌নিরূপক যন্ত্র (কম্পাস) নেই, আছে শুধু একটি ঘড়ি—পকেট ঘড়ি।

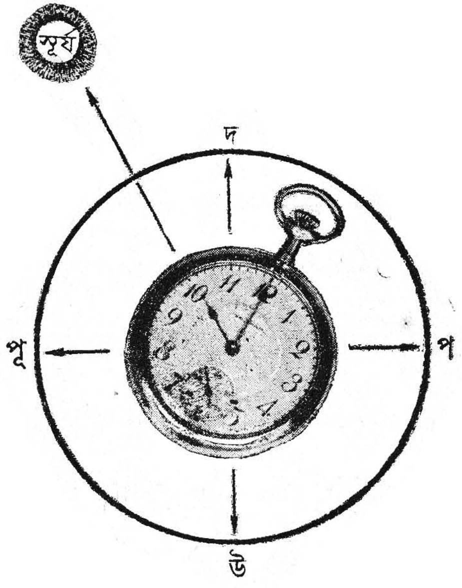

ঘন বনের গাছের মাথা ফুঁড়ে একটুখানি সূর্যের আলো বেরিয়েছে—বুঝতে পারা যায় সূর্য তখন কোথায়। কিন্তু তা থেকে দিক্‌ ঠিক করা যায় না। তাহলে এখন উপায়?—

উপায় একটা আছে। বলছি।—

ঘড়িটি ডান হাতের চেটোয় চিত করে রাখ। এমন ভাবে রাখবে যেন ঘণ্টার কাঁটাটি সূর্যের দিকে থাকে। এখন এই কাঁটা ও বারো নম্বরের ঘরটির ঠিক মাঝবরাবর যে কোণটি দেখবে, সেইটিই হলো 'দক্ষিণ' দিক্‌।

'দক্ষিণ' যদি জানতে পারা যায়, তাহলে অন্য দিক্‌গুলো স্থির করা একেবারেই কঠিন নয়। এমনি ভাবে যদি উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম পাওয়া যায়, তাহলে আর অসুবিধা কোথায়? এইবার সহজেই বন থেকে বেরিয়ে আসবে, ও তোমাদের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। কেমন, ব্যাপারটা মজার নয় কি?

———

হাঁদা-ভোঁদার আক্কেল সেলামী

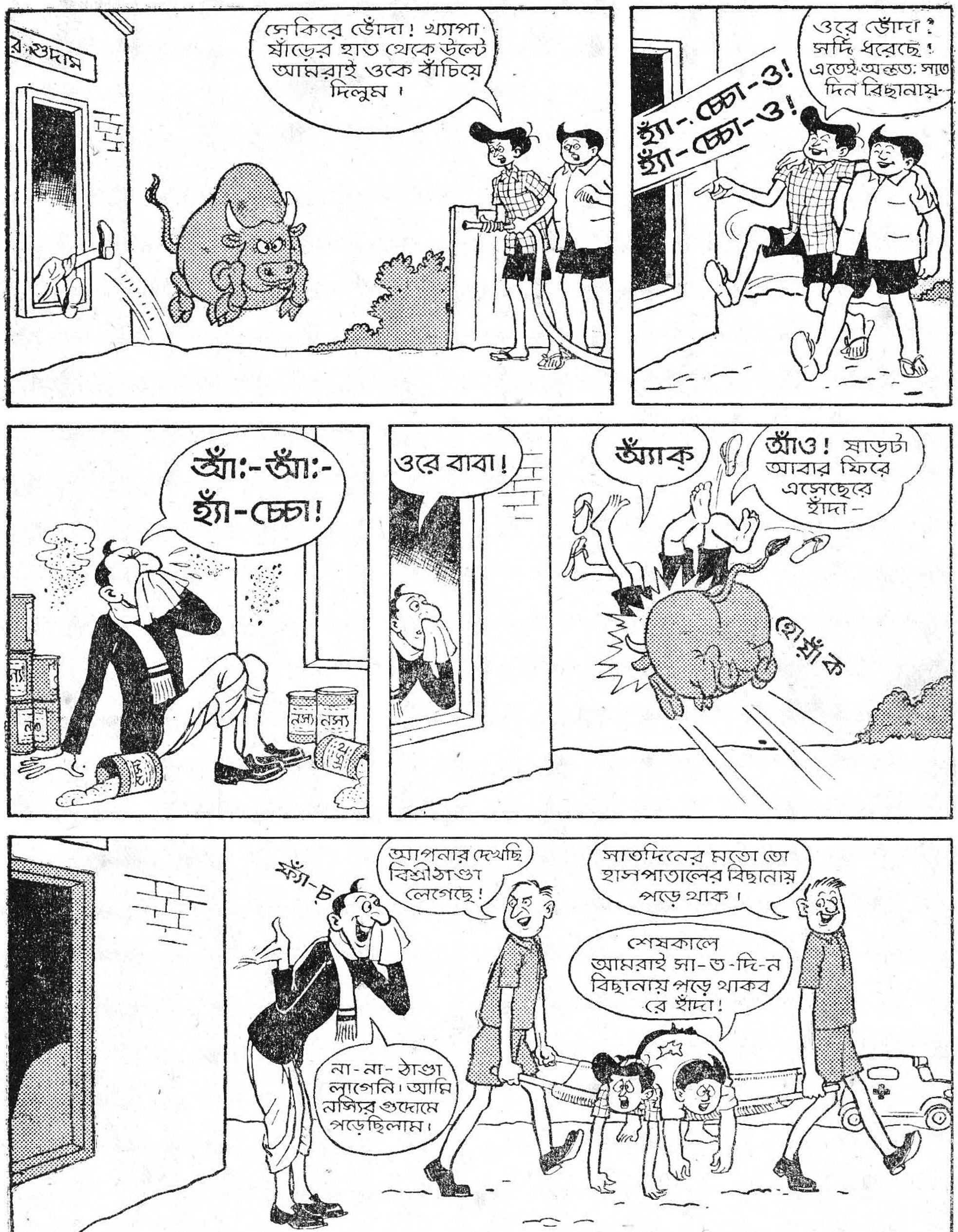

(ক্রমশঃ)

মজার পাতা

নূতন ধাঁধা

১। সাঁতার কাটিতে যদি যাও সরোবরে,
চেয়ে দেখো পিছুভাগে কত লোক মরে !
সম্মুখভাগেতে দেখো রয় সাধুজন ;
ধাঁধার হেঁয়ালী ভাই ভাবো কিছুক্ষণ। —সমীপেন্দ্র লাহিড়ী।

২। বলিল প্রথম আখর, আমি অতি ভালো,
দ্বিতীয় বলিল, আমি দান করি আলো।
বিবাদ দেখিয়া কবি বলে মনে মনে,
আরো ভালো হবে যদি বস একাসনে।
—হিমাংশুশেখর মণ্ডল, মটুকবনী, বাঁকুড়া।

৩। সবার বড় আমি তখন,
চারে মিলে থাকি যখন।
দেশ আমি তখন হই,
প্রথম ছাড়া যখন রই।
ধ্বংস হতে হয় না বাকি,
প্রথম দুটি যদি না থাকি। —সোনালী বসু, জিঞ্জিয়া, আসাম।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। ধীবর (ধী+বর) ২। বিসর্প ৩। ব্যাকরণ

গত মাসের সমস্ত ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—যোগেশদা, ইন্দুদা, রবিদা, অলক ও সমীপেন্দ্র—কলিকাতা-৯ ; গৌরী, শিবানী, শঙ্করী, মীরা ও ইরা—সি. আই. টি. বিল্ডিংস্, দমদম ; কানা, কুটু, সবিতা, ইরা ও বাণী—ঘোষ লেন।

হাওড়া—রানা, টুটুল, বুবুল ও ছোটমামা—সাঁকরাইল।

হুগলী—গোপালচন্দ্র ও রাখালচন্দ্র পৌলিক—কয়াপাট ; শ্যামাপ্রসাদ, জয়দেব, গুরুদাস, পদ্মা, প্রতিমা, অণিমা ও বড়দা—কয়াপাট ; মাধবী, বান্ধবী, স্বপন ও মণিমাণিক্য সিংহ—চন্দনপুর।

মেদিনীপুর—সুনীলকুমার মুদি ও নিমাইচন্দ্র নন্দী—জগন্নাথপুর।

বিহার—মানিক, রবি, বাবা, যতি, সুধাময় ও মুকুল—টাটা সিজুয়া কলিয়ারী ; অলক রায়চৌধুরী—পাটনা ; সন্দীপ ও রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়—ঝরিয়া।

দিল্লী—অনিল, শোভন, কবিতা ও সবিতা—দিল্লী-৬ ; বন্দনা আচার্য—নিউদিল্লী-৫।

ডব্লিউ. জি. গ্রেস ও ডেড বল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন কোলকাতার কোন একটি ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ার হঠাৎ এক অদ্ভুত আউট দিয়ে বসেছিলেন। অবশ্য ভুল বুঝতে পারায় তিনি তাঁর সিদ্ধান্তও খুব তাড়াতাড়ি পালটে ফেলেছিলেন।

ব্যাপারটা কিছুই নয়। এক বল ব্যাট দিয়ে খেলার পরই ব্যাটসম্যানের প্যাডের মধ্যে ঢুকে যায়। একজন ফিল্ডার প্যাডের ভেতর থেকে বলটা তুলে হঠাৎ আবেদন জানান—'হাউজ দ্যাট ?' আচমকা আম্পায়ারও তাঁকে দিয়ে বসলেন আউট। আগেই বলেছি প্রথমে আউট দিলেও সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ার তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। নট আউট থেকে গেলেন ব্যাটসম্যান।

আজ না হলে কি হবে, একসময় কিন্তু ঐ ভাবে বল যদি ব্যাটসম্যানের পোশাকের মধ্যে ঢুকে যেত তাহলেও 'ডেড' হত না। কিন্তু এখন নিয়ম হয়ে গেছে যে বল যদি ব্যাটসম্যানের পোশাকের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে সেটি ডেড হয়ে যাবে। এ নিয়ম তো আর চিরকাল ছিল না ! নিয়মটি কি করে হল, সেই গল্পই এবার বলি।

তোমরা নিশ্চয়ই 'ফাদার অফ ক্রিকেট' ডব্লিউ. জি. গ্রেসের নাম শুনেছ। অনেকে হয়তো দাড়ি-গোঁফে পূর্ণ বিরাটআকৃতি বুড়ো ডাক্তার গ্রেসের ছবিও দেখেছ। এই ডেড বল নিয়মটি কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি, হয়েছে ডাক্তার গ্রেসের জন্যেই।

আজ থেকে অনেকদিন আগের কথা। ইংলণ্ডের এক ক্রিকেট আসরে খেলছিলেন ডব্লিউ. জি. গ্রেস। গ্রেসের ব্যাটিং করা মানেই হল ফিল্ডার আর বোলারদের ভয়ের বিষয়। সাংঘাতিক মারকুটে ব্যাটসম্যান ছিলেন তিনি।

একটা বল খুব জোরে মেরে গ্রেস রান নিতে শুরু করলেন। দুটো রান নেবার পর তৃতীয় রান যখন তিনি নিতে শুরু করছেন, তখন একজন ফিল্ডার বলটা ধরে উঁচু করে ছুড়ে পাঠালেন উইকেটকীপারের দিকে। লাগবি তো লাগ বলটা গিয়ে লাগল গ্রেসের জামার বুক পকেটের ঠিক ওপরে, তারপর টুপ করে ঢুকে গেল পকেটের ভেতর। গ্রেসের লম্বা দাড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল বলটা।

লহমার মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গ্রেস শুরু করলেন রান নিতে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়···করে অনেকগুলো রান হয়ে গেল। ফিল্ডসম্যানরা প্রথমে

হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। কি করবেন বুঝতে না পেরে সবাই তো থ। হঠাৎ একজন ছুটে গিয়ে গ্রেসের জামার বুক পকেট থেকে বলটা তুলে নিলেন। কিন্তু গ্রেসের ততক্ষণ অনেকগুলো রান নেওয়া হয়ে গেছে।

এই ঘটনার পরই সৃষ্টি হল ডেড বল নিয়মটি। তাই সেদিন কোলকাতার কোন একটি মাঠে আম্পায়ার প্রথমে ব্যাটসম্যানকে আউট দিয়েও, তাঁর সেই সিদ্ধান্ত নাকচ করে দিলেন 'ডেড বল' নিয়ম অনুসারে।

কোলকাতা ময়দানে এখন চলছে বর্তমান মরসুমের বিদায়ী ক্রিকেট খেলার আসর। নক-আউট আর সি. এ. বি. লীগ এখন মাঠ গরম করে রেখেছে।

সেই সঙ্গে তাল দিয়ে তিন দিন ধরে চলল দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক খেলা—পূর্বাঞ্চল বনাম পশ্চিমাঞ্চল। ভারতীয় টেস্ট দলের অনেক খেলোয়াড়ই অংশ গ্রহণ করলেন এই খেলাটিতে।

মোহনবাগান ক্লাবের ৭৫ দিন ব্যাপী প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব শেষ হয়ে গেল। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কোলকাতায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস প্রভৃতি খেলার আকর্ষণীয় আসর বসেছিল। জাঁকজমকপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠানগুলিতে দেশ-বিদেশের খেলোয়াড় উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন ক্রীড়ারসিকদের।

প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের পরে আগামী ফুটবল মরসুমে ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিসন লীগের দুটি শ্রেষ্ঠ দল, চেলসী ও আর্সেন্যালএর কোলকাতায় খেলতে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মোহনবাগান ক্লাব এই ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। চেলসী কর্তৃপক্ষ মোহনবাগানকে জানিয়েছেন মে-জুন মাসে তাঁরা কোলকাতায় আসতে পারেন।

চেলসী ক্লাব এখন ইংলণ্ডের প্রচণ্ড শক্তিশালী ফুটবল দল। এবার ইংলণ্ডের প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার সম্ভাবনা চেলসী দলেরই সর্বাধিক।

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৫০ পয়সা।

আশুতোষ দেব প্রণীত

শব্দবোধ অভিধান

চতুর্থ সংস্করণ

পৃষ্ঠা ১৬৫০—মূল্য টা. ১২·০০

আশুতোষ দেব প্রণীত

বাংলা ভাষার সর্বাধুনিক অভিনব অভিধান

নববিধান

দ্বিতীয় সংস্করণ

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০৮—মূল্য—টা. ৬·০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

অপরাজিতা

মূল্য—টা. ৫·০০

এতে লিখেছেন

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- নজরুল ইসলাম
- প্রেমেন্দ্র মিত্র
- নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
- বনফুল
- হেমেন্দ্রকুমার

আরো অনেক লেখক লেখিকা। অনেক ছবি

সুষমা সেন-এর

লেখা

ঈশ্বরের মৃত্যু

মূল্য—টা. ১·০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

প্রগতিশীল দেশের কাহিনী

সোভিয়েট দেশ	...	১=২৫
ফরাসী দেশ	...	১=২৫
জাপান	...	১=২৫
জার্মান দেশ	...	১=২৫
চীন দেশ	...	১=২৫

● পরিবর্ধিত ও সংশোধিত নূতন সংস্করণ ●

তিন মাসে সহজ ইংরেজী শিক্ষা

এই পুস্তকের সাহায্যে মাত্র তিন মাসের মধ্যে ইংরেজীতে কথা বলতে, চিঠি লিখতে, দরখাস্ত লিখতে এবং আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন। —দাম টা. ২·৫০

বড়দের জন্য

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের

নানা কথা

মূল্য—টা. ৫·০০

এতে মহর্ষি রমণের অপূর্ব জীবনী ও আরো অনেক কিছু

বাহির হইল! বাহির হইল!!

ছবিতে বিবেকানন্দ

মূল্য—এক টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র : দেব লাইব্রেরী—১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, ৬৫, বিধান সরণি, কলিকাতা

শুধু পাস করা নয়—ফাস্ট হওয়ার সহজ উপায় আছে

শ্রীমধুসূদন দেব সম্পাদিত

নতুন ছাত্র-সুহৃদ্—১৯৬৫

প্রথম ভাগ—চতুর্থ শ্রেণীর জন্য **প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার বই**···দাম···টা. ৩·০০

জ্ঞান লাভ করা আর পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বই প'ড়ে ডাক্তারি পাস করা চলে কিন্তু রোগী সারাতে হ'লে বিশেষ নিয়মে ডাক্তারি করা অভ্যাসে আনা চাই। তেমনি বই পড়ে ছাত্রবৃত্তি পাস করা সোজা। কিন্তু বৃত্তি পেতে হ'লে যে নিয়মে পড়া দরকার সেইভাবে এই বইতে প্রশ্ন ও উত্তরগুলো সাজানো হয়েছে।

তাছাড়া এই পুস্তকে যা যা পাবেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে আছে।

১। **১৯৬৪ সালের ষোলটি জেলার** প্রাথমিক শেষ বৃত্তি পরীক্ষায় দেওয়া **প্রত্যেকটি প্রশ্ন ও প্রত্যেক প্রশ্নের সহজ ও সুন্দর উত্তর।**

২। চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নতুন সিলেবাস অনুসারে **ইংরেজীর প্রশ্ন ও উত্তর।**

৩। 'দ্বিতীয় ভাগ কিশলয়ে' প্রদত্ত গণিতের **নূতন প্রশ্নসমূহের** সমাধান।

৪। 'দ্বিতীয় ভাগ **কিশলয়'** পুস্তকের নূতন সংস্করণ হইতে প্রতিটি **গল্প** ও **কবিতা** লইয়া বিভিন্ন **প্রশ্ন** এবং তাহাদের সহজ ও **সংক্ষিপ্ত উত্তর।**

৫। **অতিরিক্ত আলোচনা।**

৬। গণিতের **নূতন নিয়মানুসারে** নানাধরনের প্রশ্ন ও তাহাদের সমাধান।

৭। **নূতন সিলেবাস** অনুযায়ী ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রশ্ন ও উত্তর।

৮। **প্রত্যেক জেলার** পৃথক্ পৃথক্ **মানচিত্র।**

৯। **আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের** কথা লইয়া বিবিধ প্রশ্ন ও তাহাদের উত্তর।

১০। **পয়সা, নয়া ওজন** প্রণালী ও **সর্বভারতীয় পঞ্জিকা** প্রচলন প্রভৃতি বহু **জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ।**

১১। ত্রিপুরা রাজ্যের বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর।

একমাত্র এই পুস্তকেই সকল জেলার বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পাইবেন।

ছাত্র-সুহৃদ্

দ্বিতীয় ভাগ—ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য দাম—টা. ২·৫০

এতে আছে—

১। ১৯৫৬ সাল হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

২। মধ্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর

৩। দশমিক মুদ্রা ও পয়সা

৪। পয়সার ডাক মাসুল

৫। দশমিক বা নয়া ওজন পরিমাণ

৬। দশমিক বা নয়া পরিমাপের আর্যা

৭। সর্বভারতীয় নূতন পঞ্জিকা (শকাব্দ)

পি. সি. মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স—কলিকাতা-৯